Tithir Neel Toale by Humayun Ahmed

তিথির
নীল তোয়ালে
হুমায়ূন আহমেদ
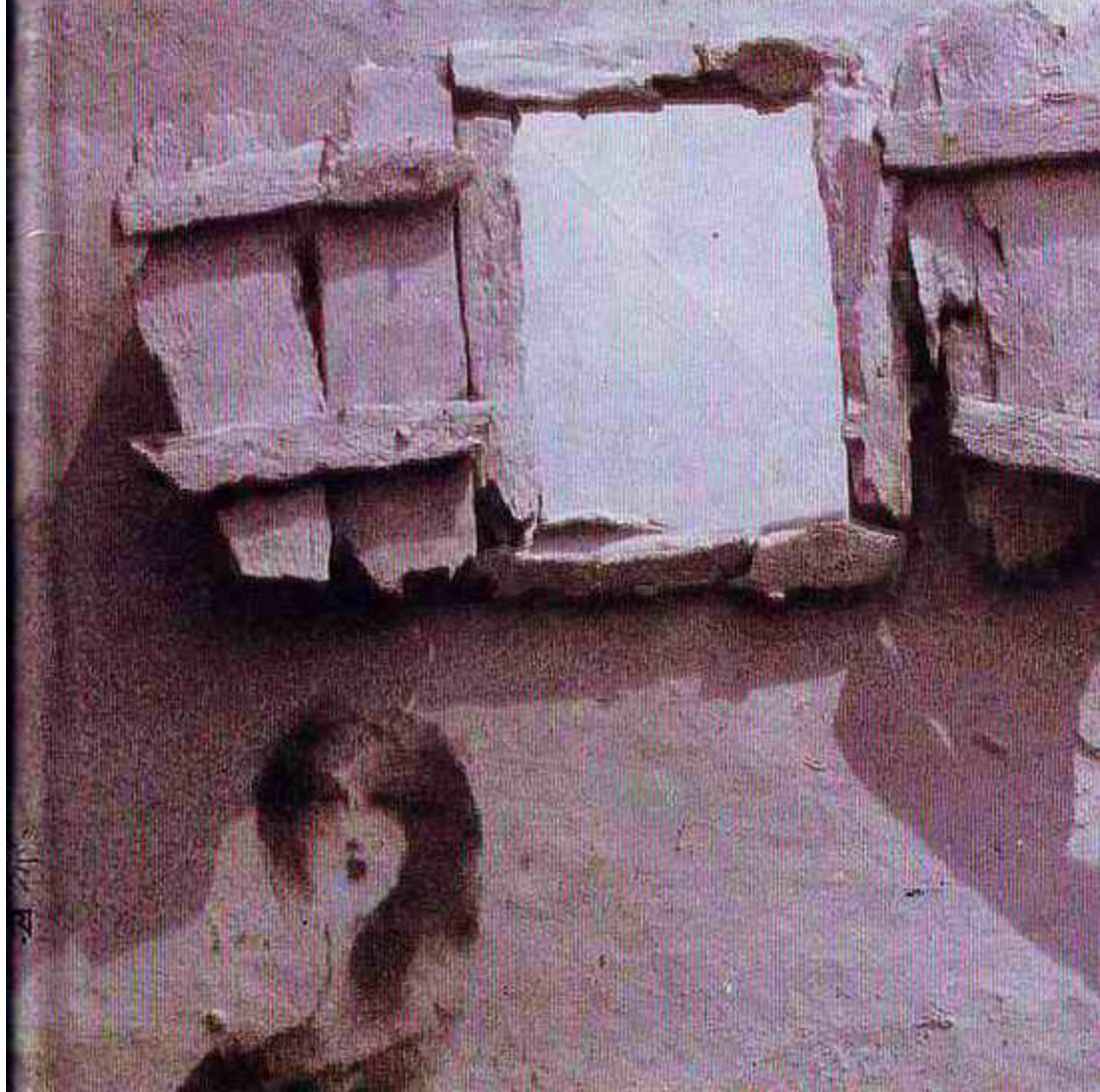
এই পৃথিবীর মধ্যে ছিল
অনন্ত এক শীতলপাটি।
অনেক দাঙ্গা ঝগড়াঝাঁটি
পার হয়ে তাই ভালোবাসা
জাগিয়েছিল অনেক আশা,
ফুটিয়েছিল অজস্র রং
খানিকটা তার গদ্যে এবং
খানিকটা তার পদ্যে ছিল।

–নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মেজাজ খারাপ করার মত পরপর কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেছে।

জাফর সাহেবের প্রেসারের সমস্যা আছে। মেজাজ খারাপ হলে প্রেসার দ্রুত ওঠা–নামা করে। চট করে মাথা ধরে যায়। ঘাড় ব্যথা করতে থাকে এবং মুখে থুথু জমতে থাকে — এর কোনটিই ভাল লক্ষণ নয়। পঞ্চাশ পার হবার পর লক্ষণ বিচার করে চলতে হয়। তাঁর বয়স পাঁচপঞ্চাশ। তিনি লক্ষণ বিচার করে চলার মনে প্রাণে চেষ্টা করেন। চেষ্টা করেন কিছুতেই যেন মেজাজ না বিগড়ে যায়। এটা প্রায় কখনোই সম্ভব হয় না।

অফিস থেকে ফেরার পর তিনটা ঘটনা ঘটল মেজাজ খারাপ করার মত। ইলেকট্রিসিটি না থাকায় লিফট বন্ধ ছিল। আটতলা পর্যন্ত হেঁটে উঠার পর কারেন্ট চলে এল। লিফট ওঠা নামা শুরু করল।

পত্রিকা চেয়েছিলেন, সকাল বেলা তাড়াহুড়ায় ভালমত পড়া হয়নি। তাঁকে ভেতরের একটা পাতা দেয়া হল, বাইরের পাতাটা না-কি পাওয়া যাচ্ছে না।

এক কাপ চা চাইলেন, তিথি এক কাপ চা দিয়ে গেল। চুমুক দিতে গিয়ে দেখেন সর ভাসছে। তিনি বললেন, সর ভাসছে কেন?

তিথি বলল, সর চায়ের চেয়ে হালকা বলেই ভাসছে। যদি ভারী হত তাহলে ডুবে যেত। বলেই সে হেসে ফেলল। জাফর সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, রসিকতা করছিস কেন?

'রসিকতা করছি না বাবা। একটা বৈজ্ঞানিক সত্য ব্যাখ্যা করলাম।'

কঠিন ধমক দিতে গিয়েও জাফর সাহেব নিজেকে সামলে নিলেন। মেজাজ ঠিক রাখতে হবে। কিছুতেই মেজাজ খারাপ হতে দেয়া যাবে না। মেজাজের জন্যে শুধু তাঁর নিজেরই যে সমস্যা হচ্ছে তাই না, পারিবারিক সমস্যাও হচ্ছে। গত চারদিন ধরে এই ফ্ল্যাট বাড়িতে শুধু তিথি এবং তিনি আছেন। তাঁর স্ত্রী শায়লা ছোট দুই মেয়ে ইরা, মীরাকে নিয়ে পল্লবীতে তাঁর মায়ের বাসায় চলে গেছেন। যাবার আগে কঠিন গলায় বলেছেন, তুমি তোমার মেজাজ নিয়ে থাক। আমি চললাম।

জাফর সাহেব বলেছেন, যেতে ইচ্ছে হলে যাবে। তবে তুমি যদি মনে কর আমি তোমাকে সাধাসাধি করে নিয়ে আসব তাহলে বিরাট ভুল করবে। এ জীবনে অনেক সাধাসাধি করেছি। আর নয়। তোমার ব্যাপারে আমি হাত ধুয়ে ফেলেছি।

ছোট মেয়ে দু'টিও যে মার সঙ্গে চলে যাবে তিনি ভাবেন নি। তিনি সারাজীবন শুনে এসেছেন মেয়েরা পিতৃভক্ত হয়। শুধু তাঁর বাড়িতেই উল্টো নিয়ম। দুই মেয়ে সুরসুর করে মা'র সঙ্গে চলে গেল। তাও যদি স্কুলে পড়া বাচ্চা মেয়ে হত একটা কথা ছিল। একটা আই.এসসি. দিয়েছে, অন্যটা আই.এ. পড়ে, সেকেণ্ড ইয়ার। বড় মেয়ে তিথিও হয়ত চলে যেত। নেহায়েত হিউমেনিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে যায় নি। ইরা মীরা খুব ভাল করে জানে তিনি এদের না দেখলে অস্থির বোধ করেন। সবাইকে এক সঙ্গে না নিয়ে বসলে খেতে পারেন না। মেজাজ খুব খারাপ হয়ে যায়। কাকে কখন কি বলছেন খেয়াল থাকে না।

শায়লা চলে যাবার পরদিন কাজের মেয়ে রাশেদা তার টিনের ট্রাংক এবং পুটলা-পুটলি নিয়ে বিদেয় হয়ে গেল। যাবার সময় বলল, "ভুল ত্রুটি কিছু হইলে নিজ গুণে ক্ষমা দিবেন।"

জাফর সাহেব বললেন, বেতন পাওনা আছে না? বেতন নিয়ে যাও।

'আমার বেতনের দরকার নাই।'

শেষ মুহূর্তে জাফর সাহেব আপোষের সুর বের করলেন। রাশেদা চলে গেলে ভয়াবহ সমস্যা হবে। তিথি সামান্য এক কাপ চা পর্যন্ত ঠিকমত বানাতে পারে না। রান্নার প্রশ্নই আসে না। ঢাকা শহরে ভাল কাজের লোক পাওয়া পরশ পাথর পাবার মত। জাফর সাহেব রাশেদার দিকে তাকিয়ে প্রায় মধুর গলায় বললেন, চলে যাচ্ছ কেন তাই তো বুঝলাম না। তোমাকে তেমন কিছু বলা হয়নি। রাশিদা বলল, আমি মিজাজের ধার ধারি না। যে বাড়িত আমারে ইংরেজি গাইল দেয় হেই বাড়িত কাম করি না।

ইংরেজি গালির ব্যাপারটা সত্য। জাফর সাহেব রাশেদাকে স্টুপিড ব্রেইনলেস ক্রিয়েচার বলেছেন। এবং তিনি মনে করেন তাঁর জায়গায় অন্য যে কেউ এরচে' কঠিন গালি দিত। তিনি অফিস থেকে এসে স্যান্ডেল চাইলেন। রাশেদা স্যান্ডেল দিল ঠিকই, কিন্তু দু'টা দু'পাটির। তিনি কিছু বললেন না। চা চাইলেন। চা এনে দিল। চুমুক দিয়ে দেখেন মিষ্টি হয়নি। তিনি বললেন, রাশেদা, চিনি লাগবে। সে রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, চিনি দেওয়া আছে, লাড়া দেন। নাড়া দিতে চামচ লাগবে। তিনি চামচ চাইলেন, রাশেদা একটা তরকারির চামচ নিয়ে উপস্থিত হল। চামচ দেখেই তাঁর মেজাজ খারাপ হল, তবু তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, এই চামচ চায়ের কাপে ঢুকবে?

রাশেদা চামচ উল্টে পেছনটা দিয়ে ডাল ঘোঁটার মত তাঁর চায়ের কাপ ঘুঁটে দিল। শুধু তখনি তিনি বললেন, স্টুপিড, ব্রেইনলেস ক্রিয়েচার। অবশ্যি কঠিন গলায় বললেন। মিষ্টি করে কাউকে স্টুপিড বলা যায় না। সেই বলাটাই কাল হয়েছে।

জাফর সাহেব মেজাজ আয়ত্তে রাখার চেষ্টা অনেকদিন থেকেই করছেন। পারছেন না। সবাই সবকিছু পারে না, চেষ্টাও করে না। তিনি চেষ্টা করছেন। সেই চেষ্টা কারোর চোখে পড়ছে না। দু'শ তেত্রিশ টাকা দিয়ে বই কিনে এনেছেন — **'Self control'**. সাতশ' পৃষ্ঠার বই। সেখানে নেই, এমন জিনিস নেই। একটা অংশ আছে **Yoga.** সেই অংশে বলা হয়েছে — প্রতি রাতে শোবার আগে পাঁচ মিনিট শবাসন করলে নিজের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে।

শবাসনের নিয়ম হল শক্ত মেঝেতে খালি গায়ে (গায়ে কোন রকম কাপড়ই থাকতে পারবে না, অর্ন্তবাসও নয়) শুয়ে থাকতে হবে। চোখ বন্ধ করে নিজেকে ভাবতে হবে একজন মৃত মানুষ। তাঁর দেহটা একটা মৃত মানুষের দেহ। এই দেহের কোন অনুভূতি নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এই দেহের কোন যোগ নেই।

পাঁচপঞ্চাশ বছর বয়সে নেংটো হয়ে মেঝেতে শুয়ে থাকার কল্পনাই ভয়াবহ। তিনি এই ভয়াবহ ব্যাপারটাও করলেন। দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে মেঝেতে শুয়ে রইলেন। পুরোপুরি নগ্ন হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। তিনি কোমরে একটা টাওয়েল জড়িয়ে রাখলেন। লাভের মধ্যে লাভ এই হল, তাঁর ঠাণ্ডা লেগে গেল। কাশি, সর্দি। টনসিল ফুলে একাকার। ঢোক গিলতে পারেন না।

মানুষের কত সমস্যা থাকে। তাঁর একটিই সমস্যা। মেজাজ সমস্যা। কেউ তা সহজভাবে নিতে পারে না। মানুষের অসংখ্য সৎগুণের কিছু কিছু তাঁরও নিশ্চয়ই আছে। সেসব কেউ দেখবে না।

শায়লা বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। চারদিনে একবার টেলিফোন পর্যন্ত করেনি। মেয়ে দু'টিও না। রাশেদা চলে গেছে জানার পর তাঁর কি উচিত ছিল না বাসায় ফিরে আসা?

এই যে তিথি সরভর্তি এক কাপ চা তাঁর হাতে দিল, চাপা হাসি হাসতে হাসতে বৈজ্ঞানিক সত্য ব্যাখ্যা করতে লাগল, তার কি উচিত ছিল না, বলা — বাবা, কাপটা আমার কাছে দাও। আমি আরেক কাপ বানিয়ে নিয়ে আসছি। এমন না যে সে পরীক্ষার চাপে ব্যতিব্যস্ত। তার এম.এসসি. ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। সে রেজাল্টের জন্যে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষার এই সময়টা সে তো রান্নাবান্না শেখার চেষ্টাও করতে পারে। একদিন বিয়ে হবে, নিজের সংসার শুরু করবে। এই যুগের মেয়েরা শুধু লেখাপড়া শিখবে, রান্নাবান্না শিখবে না? সামান্য এক কাপ চা-ও বানাতে পারবে না। তা তো হয় না। সরভর্তি চা হাতে নিয়ে জাফর সাহেব বসে

রইলেন।

অনেকক্ষণ ধরে কলিংবেল বাজছে। রাশেদা নেই যে কলিংবেল শুনে দরজা খুলে দেবে। তিথি কি করছে? সে-কি তার নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে? তাঁর ইচ্ছা করছে কড়া গলায় ডাকেন — 'তিথি!'

ডাকার আগেই তিথি উপস্থিত হল। হাতে চায়ের কাপ।

'বাবা, নাও — এবার চায়ে কোন সর নেই ছেঁকে এনেছি।

জাফর সাহেব যন্ত্রের মত চায়ের কাপ নিতে নিতে বললেন, কলিংবেল বাজছে।

'দরজা খোলা হয়েছে, বাবা।'

'কে এসেছে?'

'অচেনা একজন। যে এসেছে সে ড্রয়িং রুমে বসেছে।'

জাফর সাহেব চায়ের কাপ হাতে উঠতে গেলেন। তিথি হাত ধরে বাবাকে বসিয়ে দিল। নরম গলায় বলল, চা শেষ করে তারপর যাবে। তার আগে না।

'কেন?'

'যে এসেছে, আমার ধারণা, তাকে দেখে তোমার মেজাজ আরো খারাপ হবে। মাঝখান থেকে তোমার চা খাওয়া হবে না। চায়ে কি চিনি হয়েছে?'

'হুঁ।'

'চায়ের টেম্পারেচর ঠিক আছে? বেশি ঠাণ্ডা কিংবা বেশি গরম হয়নি তো?'

'না। ঠিকই আছে।'

তিথি বাবার সামনে মোড়া পেতে বসল। জাফর সাহেব লক্ষ্য করলেন, মেয়েকে কেমন জানি অচেনা অচেনা লাগছে। চুল-টুল কেটেছে, কিংবা কোন-একটা কায়দা করেছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মেয়েদের চুল কাটার দোকান হওয়ায় এই এক বিপদ হয়েছে। নাপিতের কাছে ছেলেরা যাবে। মেয়েরা কেন যাবে? কি হচ্ছে দেশটার?

জাফর সাহেব বললেন, তোকে এমন লাগছে কেন?'

'কেমন লাগছে?'

'কি রকম যেন লাগছে! চুল কেটেছিস?'

'না, কানে দুল পরেছি।'

জাফর সাহেব মেয়ের কানের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। হাতের চুড়ির চেয়ে বড় দু'টা রিং, মাঝারি সাইজের হাতীর কানের জন্যে মানানসই হত মানুষের কানের জন্যে না। সুস্থ মাথার কেউ এই দুল কানে পরে? এই ফ্যাশান কবে চালু হল?

'সুন্দর লাগছে না, বাবা?'

জাফর সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, এগুলির নাম কি?

'আলাদা কোন নাম নেই। আমি নাম দিয়েছি পাংকু রিং, পাংকু মেয়েদের রিং।'

'পাংকু মেয়ে মানে কি?'

'তুমি বুঝবে না। তোমার চা খাওয়া কি শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমি বসার ঘরে যাও। যে বসে আছে তাকে দ্রুত বিদেয় করে আস। তবে ফর গডস সেক, রাগারাগি করবে না।'

'রাগারাগি করব কেন?'

'রাগারাগি করবে কারণ ভদ্রলোক কাদামাখা জুতা পায়ে কার্পেটে হাঁটাহাঁটি করছেন। তোমার কাছে হয়ত অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু তাঁর হাতে চারটা মুরগি। মুরগিগুলি তিনি কার্পেটে শুইয়ে রেখেছেন। আমার মনে হয় তারা ইতিমধ্যে কার্পেট নোংরা করে ফেলেছে। কারণ মুরগিগুলিতো আর জানে না আমরা নতুন কার্পেট কিনেছি।'

'ঠাট্টা করছিস?'

'মোটেই ঠাট্টা করছি না। সত্যি কথা বলছি। তোমার যা মেজাজ, ঠাট্টা করে বিপদে পড়তে চাই না।'

'সত্যি কার্পেটে মুরগি শুইয়ে রেখেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তুই বলতে পারলি না যে কার্পেট মুরগির বিছানা না?'

'আমি বলতে পারিনি, কারণ আমি অতি ভদ্র একজন তরুণী। কাউকে অপ্রস্তুত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া ভদ্রলোক কেমন মুখ কাঁচুমাচু করে বসে আছে, দেখে মায়াই লাগলো।

জাফর সাহেব গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালেন। তিথি বলল, প্লীজ বাবা, মেজাজ খারাপ করবে না। গ্রাম থেকে এসেছে, বোকাসোকা মানুষ . . .।

তিথি মিথ্যা বলেনি। সত্যি সত্যি কার্পেটের এক কোণায় চারটা মুরগি, দড়ি দিয়ে পা বাঁধা। তারা ঘাড় ঘুরিয়ে ড্রয়িং রুমের সৌন্দর্য দেখছে। ধুলোমাখা জুতো পায়ে রোগা ধরনের একটা ছেলে বসে আছে। কার্পেট মাত্র গত সপ্তাহে কেনা হয়েছে। জুট কার্পেট না কিনে তিনি প্রায় চারগুণ দাম দিয়ে সিনথেটিক শ্যাগ কার্পেট কিনেছেন। সেখানে কেউ যদি কাদা মাখা জুতা পায়ে সোফায় বসে থাকে, কেমন লাগে?

জাফর সাহেব রুক্ষ গলায় বললেন, কি ব্যাপার?

ছেলেটা লাফ দিয়ে ওঠে দাঁড়ালো। গায়ে খয়েরী রঙের চাদর। গলায় টকটকে লাল রঙের মাফলার। চোখে সানগ্লাস থাকলে ষোলকলা পূর্ণ হত। বুক পকেটে

আছে নিশ্চয়ই। এদের আর কিছু থাকুক না থাকুক — সানগ্লাস থাকে।

জাফর সাহেবের অনুমান মিথ্যা হল না। সে পা ছুঁয়ে সালাম করবার জন্য নিচু হতেই বুক পকেট থেকে একগাদা ভাংতি পয়সা, চাবীর রিং এবং একটা সানগ্লাস পড়ে গেল। জাফর সাহেব থমথমে গলায় বললেন, তুমি কে?

'আমার নাম জামান। নুরুজ্জামান।'

'ভাল কথা। ব্যাপারটা কি? মুরগি তুমি এনেছ?'

'জ্বি। আমার বাড়ি অতিথপুর, ঢাকায় একটা কাজে আসছি — আপনার আব্বা মুরগী দিয়ে দিলেন। বললেন, নিয়ে যাও।'

নুরুজ্জামান দাঁত বের করে হাসছে। পান খাওয়া লাল দাঁত। জাফর সাহেবের ইচ্ছা হচ্ছে ধমক দিয়ে ছোকড়ার হাসি বন্ধ করেন।

'এত দূর থেকে মুরগি আনার দরকার কি? ঢাকায় কি মুরগি পাওয়া যায় না।?'

'উনি আপনাকে একটা চিঠিও দিয়েছেন।'

'দেখি চিঠি।'

জাফর সাহেব চিঠি নিলেন। তাঁর মেজাজ আরো খারাপ হল। চিঠি একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। খামে বন্ধ করে যাঁর চিঠি তাঁর কাছে দিতে হয়। এই সামান্য ব্যাপারও তাঁর বাবার মাথায় এখন ঢুকছে না। কারণটা কি? মস্তিস্ক বিকৃতি শুরু হল না-কি? জাফর সাহেব ভুরু কুঁচকে অতি দ্রুত চিঠির উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলেন —

> *বাবা জাফর,*
>
> *দোয়া নিও। নুরুজ্জামানের সঙ্গে কয়েকটা মুরগি এবং কিছু ডিম পাঠালাম। ঢাকায় নুরুজ্জামানের কিছু কাজ আছে। তাকে সাহায্য করবে। সে কয়েকদিন থাকবে। তোমার বাসাতেই রাখার ব্যবস্থা কর। দরিদ্র ছেলে, ঢাকায় আত্নীয়স্বজনও নেই।*
>
> *বৌমার চিঠিতে জানলাম তোমার প্রেসারের সমস্যা হয়েছে। আধুনিক জীবনযাপনের এই হল ফল। পাখির মত আহার করবে, গাড়ি করে আফিসে গিয়ে কিছু কাগজপত্র সই করে ফিরে আসবে। খানিকক্ষণ টিভি দেখে স্লীপিং পিল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে প্রেসার তো হবেই। আমার এত বয়স হল, এখনো তো এ জাতীয় কোন সমস্যা হয়নি। শুনলাম, আজকাল তুমি অল্পতেই হৈচৈ চেঁচামেচি কর, এটাও তো ভাল কথা না। . . .*

চিঠি আর পড়তে ইচ্ছা করছে না। চিঠি মানে উপদেশ। পাঁচপঞ্চাশ বছরের ছেলেকে এত উপদেশ দেয়া যায় না, এটা উনাকে কে বুঝিয়ে দেবে? জাফর সাহেব

নুরুজ্জামানের দিকে তাকালেন।

সে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। ধপ করে সোফায় বসে পড়েনি। যাক এইটুকু ভদ্রতা তাহলে আছে! নুরুজ্জামান হড়বড় করে বলল, ১৮টা ডিম দিয়েছিলেন এখন সতেরোটা আছে। একটা ভেঙ্গে গেছে।

জাফর সাহেব লক্ষ্য করলেন সোফার এক কোনায় ডিমের পুটলি। ভাঙ্গা ডিম থেকে হলুদ রস বের হয়ে সোফায় নিশ্চয়ই লেগেছে।

'ঢাকায় কত দিন থাকবে?'

'কিছুদিন থাকতে হবে, স্যার।'

'কিছুদিন মানে কত দিন? বি স্পেসিফিক।'

'চার পাঁচ দিন।'

'এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট বাড়ি। আমার স্ত্রী বর্তমানে বাসায় নেই, কাজের লোকও নেই — এখানে থাকলে তোমার সমস্যা হবে . . .।'

নুরুজ্জামান হাসিমুখে বলল, আমার কোন অসুবিধা হবে না। প্রয়োজনে কার্পেটে শুয়ে থাকব। নরম কার্পেট।

'এই কার্পেট শোয়ার জন্যে না। ভাল কথা — জুতা পরে এই কার্পেটে উঠবে না। তুমি কর কি?'

'আমি অতিথপুর গার্লস হাইস্কুলের হেড মাস্টার।'

জাফর সাহেব বিস্মিত হলেন — একুশ-বাইশের মত বয়স বলে মনে হচ্ছে — এই ছেলে হেড মাস্টার! তার মানে কি? তিনি বললেন, অতিথপুরে মেয়েদের হাইস্কুল আছে না-কি?

'এখনো স্কুল হয় নাই। শুধু জমি পাওয়া গেছে। মেয়েদের স্কুলের জন্যে একজন পঞ্চাশ ডেসিমেল জমি দান করেছে। সবাই আমাকে ধরল — তুমি জোগাড়-যন্ত্র করে স্কুল দাঁড়া করায়ে দাও . . . এই জন্যেই ঢাকায় আসছি।'

'বুঝলাম না। ঢাকায় এসে কি হবে?'

'স্কুলের স্যাংশান লাগবে। স্কুল ঘর তোলার জন্যে সাহায্য যদি কিছু পাওয়া যায়। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে একটু দেখা করব।'

জাফর সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি যে ভাবে কথা বলছ তাতে মনে হয় শিক্ষামন্ত্রী তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছেন।

'আপনি একটু চেষ্টা-চরিত্র করলে . . . .।'

'আমি চেষ্টা করলেও কিছু হবে না। শিক্ষামন্ত্রী কোন বাড়ির কাছের ব্যাপার না। মন্ত্রীদের কোন দায় পড়েনি অতিথপুরের নুরুজ্জামানের সঙ্গে দেখা করার। তাদের আরো কাজ আছে। বুঝতে পেরেছ?

'জ্বি স্যার।'

'আমার মনে হয় তোমার যা করা উচিত তা হল স্থানীয় এম.পি.-র সঙ্গে যোগাযোগ করা। মন্ত্রী অনেক বড় ব্যাপার।'

'তবু আসলাম যখন একটু চেষ্টা করে দেখি।'

জাফর সাহেব বললেন, তোমার পড়াশোনা কতদূর?

'বি.এ. পাশ করেছি। গৌরীপুর কলেজ। এম.এ. পাশ করার ইচ্ছা ছিল, টাকা-পয়সা জোগাড় করতে পারলাম না। মানুষের সব ইচ্ছা তো আর . . .'

নুরুজ্জামান কথা শেষ করল না। সোফায় বসে জুতা খুলতে লাগল। জুতা জোড়া রেখে এল কার্পেটের বাইরে। অর্থাৎ এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে সে এখানে কিছুদিন থাকবে। টকটকে লাল রঙের মোজা দেখা যাচ্ছে। কোন সুস্থ মাথার লোক এরকম মোজা পরে? নতুন মোজা। এক কোনায় এখনো লেবেল লাগানো। লেবেল খুলেনি। কিংবা কে জানে এরা হয়ত লেবেল খুলে না।

সে এখন হ্যান্ডব্যাগের চেইন খুলছে। জাফর সাহেব মনে মনে বললেন, গাধা! বসার ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। গাধাটা এখন নিশ্চয় লুঙ্গি বের করে পরে ফেলবে। সোফার টেবিলে পা তুলে নখ কাটবে। পকেটের ভাংতি পয়সার সঙ্গে একটা নেল কাটারও কার্পেটে পড়েছে। এই জাতীয় লোকজন কোন কাজকর্ম না থাকলে বসে বসে নখ কাটে। সেই কাটা নখ এসট্রেতে জমা করে রাখে।

তিথি বলল, কি হল বাবা? মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভয়াবহ কিছু ঘটে গেছে। ভদ্রলোক কিছুদিন এখানে থাকবেন তাই না?

'হুঁ।'

'গেস্ট রুম দেখিয়ে দেব?'

'দেখিয়ে দে।'

'রাতে ভাত খাবে?'

'খাবে তো বটেই।'

'দু'জনের মত ভাত আছে। আবার চড়াতে হবে।'

জাফর সাহেব বললেন, আমি ভাত খাব না। ঐ গাধাটাকে খাইয়ে দে।

'গাধা বলছ কেন?'

'শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। স্কুল স্যাংশান করিয়ে সে গ্রামে মেয়েদের হাইস্কুল দেবে। সেই না-কি হাইস্কুলের হেড মাস্টার।'

'তুমি বেশি রেগে যাচ্ছ, বাবা। এসো তুমি তোমার ঘরে শুয়ে থাক। শুয়ে শুয়ে তোমার Self control বইটা পড়।'

'তোর মা টেলিফোন করেছিল?'

'না। আমি টেলিফোন করব?'

'কোন দরকার নেই। লেট দেম গো টু হেল। তোর মা'র ব্যাপারে আমি হাত ধুয়ে ফেলেছি।'

'আমার কি মনে হয় জান বাবা? আমার মনে হয় তোমারই উচিত মা'কে টেলিফোন করা। রাগারাগি তুমি করেছ, মা করেনি।'

'টেলিফোন করে কি বলব — আই এ্যাম সরি?'

'কিছু বলতে হবে না। টেলিফোন করলেই মা'র রাগ পড়ে যাবে। তারপর যখন শুনবে — রাশেদা চলে গেছে। বাসায় একজন অতিথি — তখন সব সামলাবার জন্যে নিজেই আসবেন। করব টেলিফোন?'

জাফর সাহেব কিছু বললেন না। তিথি টেলিফোন সেট বাবার সামনে থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। মা'র সঙ্গে কথা বলার সময় যেন বাবা শুনতে না পান। শায়লা টেলিফোন ধরলেন। তিথি বলল, কেমন আছ মা?

শায়লা ভারী গলায় বললেন, ভাল।

'রাগ কমেছে?'

'রাগ কমাকমির এর মধ্যে কি আছে! বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছি যখন পুরোপুরিই এসেছি। তুই কি ভেবেছিস সুরসুর করে ফিরে আসব? তুই ভেবেছিস কি? তোর বাবা এক মাইল দূর থেকে ক্রলিং করে এসে আমার পায়ে ধরলেও লাভ হবে না।'

'তোমার রাগ তো কমে নি মা, বরং বেড়েছে। এদিকে বাবা পুরোপুরি ঠাণ্ডা। মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তোমার সঙ্গে কমপ্রমাইজে আসতে চান। আমাকে বললেন, তোর মা'কে টেলিফোন কর। আমি নিজের ইচ্ছেয় টেলিফোন করিনি, মা। বাবা করালো।'

'তুই তোর বাবাকে বল, আমি কোনদিনও তার ঐ সাধের ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢুকবো না। কতবড় সাহস, আমার মেয়েদের সামনে আমাকে বলে ব্রেইনলেস ক্রিয়েচার!'

'ব্রেইনলেস ক্রিয়েচার বলা বাবার মুদ্রাদোষ। রাশেদাকেও বাবা ব্রেইনলেস ক্রিয়েচার বলেছেন। এবং রাশেদাও বিদেয় হয়ে গেছে। মা আমরা দারুণ বিপদে পড়েছি। এদিকে গোদের উপর ক্যানসারের মত অতিথপুর থেকে এক অতিথি এসে উপস্থিত। উনার হবি হচ্ছে মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলা। উনি জানিয়েছেন ঢাকার সব মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে কথা না বলে উনি বিদেয় হবেন না।'

'চুপ কর। খামাখা বক বক করিস না। শুধু শুধু এত কথা বলিস কেন?'

'বাবার সঙ্গে সত্যি কথা বলবে না, মা?'

'না।'

'মা, একটা কথা বলি, শোন। তুমি কি একটু ওভার রিএক্ট করছ না? তুমি পঁচিশ বছর ধরে বাবার সঙ্গে আছ, তুমি তো জান চট করে রেগে যাওয়া বাবার স্বভাব। রেগে যায়, আবার রাগ চলেও যায়। কখনো রাগ পুষে রাখে না। রাগ পুষে রাখার ব্যাপারটা কর তুমি।'

'তুই আমাকে উপদেশ দিচ্ছিস?'

'উপদেশ দিচ্ছি না, মা। আর উপদেশ দিলেও তুমি সেই উপদেশ শোনার পাত্র না। বাবা তোমাকে ব্রেইনলেস ক্রিয়েচার বলাতে তুমি বাড়িঘর ছেড়ে চলে গেলে — বাবা তো কোন কারণ ছাড়া হঠাৎ রেগে গিয়ে তোমাকে ব্রেইনলেস ক্রিয়েচার বলেনি . . . সব মিলিয়ে বিচার করে দেখ নিশ্চয়ই তুমি এমন কিছু করেছ যেখান থেকে বাবার ধারণা হয়েছে . . .'

'তুই আমাকে বিচার করা শেখাচ্ছিস! তোর এতবড় সাহস! তুই আমাকে. . .'

'এত চেঁচাচ্ছ কেন, মা? আমি তো চেঁচাচ্ছি না। ঠিক আছে মা, তুমি বেশি রেগে যাচ্ছ। আমি রাখি, পরে কথা বলব।'

'খবর্দার! টেলিফোন রাখবি না। টেলিফোন ধরে থাক।'

'আচ্ছা মা, টেলিফোন ধরে আছি। বল কি বলবে। শান্তভাবে বল, মা। মামারা কি মনে করবে!'

তিথি টেলিফোন ধরে রইল। শায়লা বললেন, খবর্দার, কোনদিন তুই আমার সঙ্গে কথা বলবি না। কোনদিন না।

'আচ্ছা বলব না।'

'আর তুই তোর বাবাকে বলবি তাকে আমি শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। কত ধানে কত চাল বুঝিয়ে দেব। মাথা কামিয়ে তাকে আমার সামনে আসতে হবে। কতবড় সাহস আমাকে চাকর বাকরের সামনে অপমান করে। আমাকে 'ষ্টুপিড' বলে। ষ্টুপিড পানিতে গুলে তাকে খাইয়ে দেব।'

শায়লা ঘটাং করে টেলিফোন রাখলেন।

তিথি বাবার ঘরে ঢুকল। জাফর সাহেব বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। হাতে সত্যি সত্যি 'Self control'-এর বই। তিথিকে ঢুকতে দেখেই আগ্রহ নিয়ে বললেন, কথা হয়েছে তোর মা'র সঙ্গে?

'হ্যাঁ হয়েছে।'

'কি বলল?'

'তিথি ইতস্তত করে বলল, তেমন কিছু বলেনি। তবে মনে হয় তাঁর নিজের আচার-আচরণে খানিকটা লজ্জিত। এখন লজ্জায় পড়ে টেলিফোনও করতে পারছে

না। ফিরেও আসতে পারছে না। তুমি বরং কাল নিজে গিয়ে নিয়ে এসো। প্রথমে হয়ত খানিকক্ষণ মিথ্যা রাগ দেখিয়ে চেঁচামেচি করবে। তুমি পাত্তা দিও না।'

তিথি লক্ষ্য করল তার বাবার মুখ থেকে অন্ধকার অনেকখানি সরে গেছে। বাবার অনন্দিত মুখের দিকে তাকিয়ে বড় মায়া লাগছে। মা কেন যে এই মানুষটার উপর রাগ করে!

জাফর সাহেব ইতস্ততঃ করে বললেন, ইরা আর মীরা ওরা কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিল?

'হ্যাঁ বাবা, চাচ্ছিল। আমিই তোমাকে দেইনি। মা'র সঙ্গে কথা না বলে ওদের সঙ্গে কথা বললে — মা রেগে যাবে। তুমি যেমন ফট করে রেগে যাও, মাও তো সে রকম রাগে।'

'দ্যাটস ট্রু। তুই যা, ঐ ছেলেটার ঘর দেখিয়ে দে।'

তিথি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রওনা হল।

নুরুজ্জামান লুঙ্গি পরে সোফার এক কোণায় চুপচাপ বসে আছে। তিথিকে দেখে আগের মত লাফ দিয়ে দাঁড়াল। তিথি বলল, আসুন, আপনাকে আপনার থাকার ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি। সরি, অনেকক্ষণ একা একা বসিয়ে রেখেছি।

নুরুজ্জামান মেয়েটির ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে গেল। 'অনেকক্ষণ একা একা বসিয়ে রেখেছি' — কি সুন্দর করে কথাগুলি বলল। বলার কোন দরকার ছিল না। তাকে তো একা একাই বসিয়ে রাখবে। তার সঙ্গে গল্প করার কার এমন দায় পড়েছে।

নুরুজ্জামান বলল, ডিমগুলো কি করব। এখানে সতেরোটা ডিম আছে। আঠারোটা দিয়েছিলেন একটা ভেঙ্গে গেছে।

'ডিমের ব্যবস্থা আমি করব আপনি আসুন।'

নুরুজ্জামান উঠে এল।

'এটা আপনার ঘর। সঙ্গে এ্যাটাচড্ বাথরুম আছে। বাথরুমের একটা জিনিস আপনাকে দেখিয়ে দি। এটা গরম পানির, এটা ঠাণ্ডা পানির কল। গোসলের সময় ঠাণ্ডা-গরম দু'রকম মিশিয়ে নেবেন। শুধু গরম পানির কল ছাড়লে কিন্তু বিপদে পড়বেন। খুব গরম পানি আসে। একেবারে বয়েলিং ওয়াটার। মশারি নেই। মশারির দরকারও নেই। ন'তলা পর্যন্ত মশা উঠতে পারে না। কাবার্ডে দু'টা কম্বল আছে। জানালা-টানালা বন্ধ থাকলে শীত আসে না। একটা কম্বলেও শীত মানার কথা, তারপরেও যদি শীত না মানে . . .। ভাত দিতে একটু দেরি হবে, আপনার কি খুব খিদে পেয়েছে?'

নুরুজ্জামান বলল, জ্বি।

'তাহলে আমি বরং এক কাপ চা আর বিসকিট দিয়ে যাই। আধঘন্টার মধ্যে ভাত দিয়ে দেব?'

'জ্বি আচ্ছা।'

তিথি রান্নাঘরের দিক রওনা হল। তার মায়া লাগছে। খিদে লেগেছে কি–না জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ। কেউ বলে না। বলার নিয়ম নেই। সভ্য সমাজের নিয়ম হচ্ছে ভদ্রতা করে বলতে হয়, খিদে নেই।

খাবার ঘরের এক কোণায় চারটা মুরগি পায়ে দড়ি বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। এরা কোন শব্দ করছে না। সবক'টা একসঙ্গে ঘাড় উঁচিয়ে তিথিকে দেখছে। তিথির মনে হল মুরগিগুলি খুব অবাক হচ্ছে — এতদিন তারা গ্রামের ঝোপে–ঝাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, আজ হঠাৎ ন'তলা ফ্ল্যাটে। তাদের পায়ের নিচে মাটি নেই আছে শ্যাগ কার্পেট।

তিথি প্লাস্টিকের একটা বাটিতে খানিকটা পানি এগিয়ে দিল। চারজনই ঝাঁপিয়ে পড়ল পানির বাটির উপর। আহা বেচারারা! তৃষ্ণায় নিশ্চয়ই এদের বুক ফেটে যাচ্ছিল। মুখ ফুটে বলতে পারছিল না। তিথি খানিকটা চাল এনে দিল। খুঁটে খুঁটে চাল খাচ্ছে। পা একসঙ্গে বাঁধা থাকায় আরাম করে খেতেও পারছে না। আহা বেচারারা! আহা।

'নিন, চা নিন।'

নুরুজ্জামান উঠে দাঁড়িয়ে চায়ের কাপ হাতে নিল।

'ঘরে বিসকিট নেই। এক স্লাইস রুটি মাখন লাগিয়ে এনেছি। চা খেয়ে একটা কাজ করে দেবেন?'

নুরুজ্জামান বিস্মিত হয়ে বলল, কি কাজ?

'মুরগিগুলির পায়ে দঁড়ি বাঁধা। দড়ি খুলে দেবেন। কাজের লোকের একটা ঘর আছে রান্নাঘরের পাশে। ঐখানে ছেড়ে রাখব। সারাদিন বাঁধা ছিল। খুব মায়া লাগছে।'

নুরুজ্জামান বলল, জ্বি আচ্ছা।

তিথি একটুক্ষণ থেমে থেকে বলল, আপনি যখন দেশে ফিরে যাবেন তখন মুরগিগুলি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। গ্রামে নিয়ে ছেড়ে দেবেন। পারবেন না?

'জ্বি পারব।'

তিথি কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলল, ওরা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে দেখছিল। পানি দিলাম, এত আগ্রহ করে পানি খাচ্ছিল। মায়া পড়ে গেছে।

নুরুজ্জামান বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে। কি অদ্ভুত কথা বলছে এই মেয়ে।

একটা মানুষকে একা একা খেতে দেয়া যায় না। আবার নিতান্ত অপরিচিত একজন মানুষকে ভাত বেড়ে দিয়ে বসেও থাকা যায় না। তিথি টেবিলে ভাত বাড়ছে। জাফর সাহেব জানিয়েছেন তিনি রাতে ভাত খাবেন না। এক গ্লাস লেবুর সরবত খাবেন। ঘরে লেবু নেই। লেবু ছাড়া লেবুর সরবত বানাতে হবে। তিথির ধারণা তার বাবা লেবু নেই কেন এ নিয়েও খানিকক্ষণ হৈ চৈ করবেন। তার নিজেরও ক্ষিধে লেগেছে। লোকটির খাওয়া শেষ হবার পরই তার খাওয়ার প্রশ্ন আসে। সে কতক্ষণ ধরে খাবে কে জানে? গ্রামের মানুষ বেশি খায় কিন্তু সেই বেশি খাওয়াটা দ্রুত খায় না ধীরে ধীরে খায় তা তার জানা নেই।

নুরুজ্জামান ইতিমধ্যেই লুঙ্গী পরে মোটামুটি ঘরোয়া ভাব ধরে ফেলেছে। লুঙ্গী সাদা হলেও গায়ের গেঞ্জীটা গাঢ় নীল। চুলে তেল দেয়ায় মাথা চকচক করছে।

সে খুব সহজ ভঙ্গিতে টেবিলে খেতে বসল। তিথির দিকে তাকিয়ে বলল, কাঁটা চামচ দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস নাই।

তিথি বলল, আপনাকে কাঁটা চামচ দেয়া হয়নি হাত দিয়েই খাবেন।

'হাত ধোয়ার পানি?'

'আসুন বেসিন দেখিয়ে দেই। বেসিনে হাত ধুয়ে নিন। হাত ধুয়ে খেতে শুরু করুন। আমি বাবাকে এক গ্লাস সরবত বানিয়ে দিয়ে আসি। একা একা খেতে আপনার অসুবিধা হবে নাতো?'

'জ্বি না। অসুবিধা কি?'

নুরুজ্জামান তিথির ভদ্রতায় আরেকবার মুগ্ধ হল।

জাফর সাহেব ভুড়ু কুঁচকে বললেন, লেবুর সরবত দিতে বললাম — লেবু কোথায়?

'লেবু নেই বাবা।'

'থাকবে না কেন? নিশ্চয়ই আছে। ভালমত খুঁজে দেখ।'

'খুঁজে যদি লেবু পাওয়াও যায় — তোমাকে দেয়া হবে না। রাতে লেবু খাওয়া ঠিক না — পেটে এসিডিটি হয়। তোমার এই বয়সে পেটে এসিডিটি হওয়া ঠিক না। পেটে গ্যাস হবে। সেই গ্যাস ফুসফুসে চাপ দেবে। অক্সিজেন ফুসফুসে আসতে দেবে না — ফলে ব্রেইনে অক্সিজেনের অভাব হবে। মাথা ঘুরতে থাকবে — এক সময় দেখা যাবে পালস পাওয়া যাচ্ছে না।'

জাফর সাহেব অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন —।

'আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বাবা?'

'হচ্ছে।'

'তাহলে এ ভাবে তাকিয়ে আছ কেন? সরবত খাও।'

তিনি এক চুমুকে গ্লাস শেষ করলেন। তিথিকে গ্লাস ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, গাধাটা খেয়েছে?

'খেতে বসেছে।'

'তুই খেয়েছিস?'

'না। উনার খাওয়া হলেই খেতে বসব। অবশ্যি ক্ষিধে মরে গেছে। খেতে ইচ্ছাও করছে না। একা একা খেতে ভালও লাগে না।'

'তুই খেতে বসার সময় আমাকে ডাকবি। আমি বসব তোর সঙ্গে।'

'আমার সঙ্গে তোমার বসতে হবে না। তোমার ঘুম পেয়েছে তুমি ঘুমিয়ে পড়।'

নুরুজ্জামান হাত গুটিয়ে বসে আছে। এখনো খেতে শুরু করে নি। তিথি অবাক হয়ে বলল, খাচ্ছেন না কেন?

'নিমক নাই। নিমকের জন্যে বসে আছি।'

তিথি রান্নাঘর থেকে লবনের বাটি এনে দিল। লবনকে নিমক বলার অর্থ তার কাছে পরিস্কার হচ্ছে না, পাতে খাবার লবনকে সম্মান দেখিয়ে নিমক বলা হয় কি? অনেকে যেমন দৈ বলে না। বলে দধি। বড় সাইজের রই মাছকে রুই মাছ বলে না, বলে রুহিত মাছ। তিথি টেবিলের অন্য প্রান্তে বসেছে। নুরুজ্জামানের 'নিমক' খাওয়া বেশ আগ্রহ নিয়ে দেখছে। খানিকটা লবণ প্লেটের এক কোনায় নিল। খানিকটা নিল তর্জুনির মাথায়। সেই 'নিমক' জীবে ছুঁইয়ে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কি যেন বলল। কোন দোয়া হবে। একজন মানুষের সামনে চুপচাপ বসে থাকা যায় না। তিথি বলল, ঢাকায় ক'দিন থাকবেন?'

'মিনিষ্টার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করব। তারপর একটু অন্য কাজও আছে।'

'আর কি কাজ?'

'একটু ঘুরাফিরা করব। ঢাকায় আগেও দুইবার এসেছি । ঘুরাফিরা করতে পারি নাই। দেখার জিনিসেরতো এই শহরে কোন অভাব নাই। এইবার ভাবছি — যতটা পারি দেখব। ডায়ানার একটা সন্তান হয়েছে। সেইটাও দেখে যাব।'

'আপনার কথা বুঝলাম না। কার সন্তান হয়েছে?'

'ডায়ানার।'

'ডায়ানাটা কে?'

'চিড়িয়াখানায় যে মেয়ে জলহস্তি আছে তার নাম ডায়ানা। খবরের কাগজে দেখেছি — ডায়ানার একটা পুত্র সন্তান হয়েছে। আগে একটা কন্যা হয়েছিল।'

'ও আচ্ছা। আপনি তাহলে চিড়িয়াখানা — শিশুপার্ক এই সব ঘুরে ঘুরে

দেখবেন?'

'শিশুপার্ক দেখব না। গতবার দেখে গেছি। বড় ভাল লেগেছিল।'

'ভাল ভাল জিনিষতো বার বার দেখা যায়।'

'তাও ঠিক।'

'খেতে পারছেনতো?'

'জ্বি পারছি। পারব না কেন? গ্রাম দেশে এত পদ দিয়ে তো কখনো খাই না। দুইটা পদ থাকে। তরকারী — ডাল। কোনকোনদিন ভাজি আর ডাল।'

'ঢাকার কাজ কর্ম সারতে আপনার তাহলে কিছু সময় লাগবে?'

'জ্বি লাগবে। আমাদের এলাকায় একজন লোক আছে টেলিভিশনে কাজ করে। উনার সাথেও একটু দেখা করব। উনার ঠিকানা আনতে আবার ভুলে গেছি। এই নিয়ে একটু দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত। তবে টেলিভিশনে গেলে নিশ্চয়ই উনার ঠিকানা পাব।'

'হ্যাঁ পাবেন।'

'উনি বলেছিলেন ঢাকায় আসলে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। পারলে আমাকে একটা সুযোগ করে দিবেন বলেছিলেন।'

তিথি বিস্মিত হয়ে বলল, কিসের সুযোগ?

নুরুজ্জামান সহজ গলায় বলল — আমি পাতার বাঁশি বাজাতে পারি। উনি শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন। তখন ঠিকানা দিয়ে বলেছিলেন — বাচ্চু মিয়া ঢাকায় আসলে দেখা করবেন। আমার ডাক নাম বাচ্চু।

'আপনি তাহলে একজন পাতাবাদক? ভাল ভাল।'

'একদিন শুনাবো আপনাকে। পাতা পাওয়া গেলে হয়। সব পাতায় আবার সুর উঠে না। শহর বন্দর জায়গা পাতা পাওয়া মুশকিল। আশে পাশে অশ্বথ গাছ আছে?'

'জানি না আছে কি–না।'

'আমগাছের পাতা দিয়েও হয়। খুব ভাল হয় না। দেখি অশ্বত্থের পাতা জোগাড় করব। আছে নিশ্চয়ই। এত বড় শহর থাকারতো কথা।'

তিথি বলল, আপনাকে এত কষ্ট করার দরকার নেই। যদি গ্রামে কখনো যাই তখন শুনাবেন।

'আর আপনারা কি কখনো গ্রামে যাবেন। আপনারা হয়েছেন শহরবাসী। শহরের নেশা একবার লেগে গেলে গ্রাম ভাল লাগে না। শহরের নেশা বড় খারাপ নেশা।'

তিথি বলল, তাও ঠিক। তবে আমার গ্রাম খুব খারাপ লাগে না। একবার গিয়ে দাদাজানের সঙ্গে দু'সপ্তাহ ছিলাম।

'আমি জানি উনি আমাকে বলেছেন। উনি আমাকে খুব পেয়ার করেন। ও আচ্ছা ভুলেই গেছি উনি আপনাকে একটা পত্র দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন জরুরী। আমি নিয়ে আসি।'

নুরুজ্জামান উঠতে গেল। তিথি বলল, খাওয়া শেষ করুন। তারপর দেবেন।

নুরুজ্জামান খাওয়া শেষ করল। খাওয়ার শেষ পর্বও দর্শণীয়। প্লেটে খানিকটা পানি ঢেলে সেই পানি দিয়ে প্লেট পরিষ্কার করে, সেই পানি ডালের মত চুমুক দিয়ে খাওয়া। রীতিমত গা গিনগিন করা ব্যাপার। তিথি তাকিয়ে আছে বলেই লজ্জিত গলায় বলল, নবী এ করিম এই ভাবে খেতেন। এতে আয়ু বৃদ্ধি হয়।

'ও আচ্ছা।'

'ঘরে কি পান আছে?'

'জ্বি-না। মা পান খান। তিনি বাসায় নেইতো — তাই তাঁর পানের সরঞ্জামও নেই। আচ্ছা আমি পানের ব্যবস্থা করছি।'

'কি ভাবে করবেন?'

'রিসিপসানে লোকজন আছে — এদের বললে ওরা পান এনে উপরে দিয়ে যাবে।'

'সামান্য পানের জন্যে আপনাকে নিচে নামার দরকার নাই।'

'আমাকে নিচে নামতে হবে না। আমি ইন্টারকমে বলে দেব।'

তিথি কিছু খেতে পারল না। ভাতের গামলা ফ্যানের নিচে এতক্ষণ ছিল বলেই ভাত ঠাণ্ডা কড়কড়া হয়ে গেছে। চিবানো যায় না — এমন অবস্থা। তরকারীও কোনটিতে লবন হয় নি। নুরুজ্জামান প্রচুর লবন কেন নিয়েছে তা এখন বোঝা যাচ্ছে। তিথির খুব ক্লান্তি লাগছে। অনেক কাজ বাকি। টেবিল থেকে থালাবাসন সরানো, পারিস্কার করা। রান্নাঘরও নোংরা হয়ে আছে। শোবার আগে সব ঝকঝকে না করে রাখলে ভাল ঘুম হয় না। ঘুমের মধ্যেও বার বার মনে হয় কি যেন বাকি থাকল। কি যেন বাকি থাকল।

সব কাজ শেষ করে এক পেয়ালা চা হাতে তিথি বারান্দায় এসে বসল। ঘুমুতে যাবার আগে এটি হচ্ছে তার শেষ রুটিন। ন' তলার দক্ষিণমুখী বারান্দা। খুব হাওয়া। এক একবার মনে হয় বেতের চেয়ার সহ তাকে উল্টে ফেলে দিচ্ছে। আকাশের কাছাকাছি বাস করার অনেক সুবিধার একটি হচ্ছে — হাওয়ার সঙ্গে খেলার সুযোগ। আজ আবার জোছনা হয়েছে। বারান্দা চাঁদের আলোয় মাখামাখি। জোছনাটাও বেশ অদ্ভুত। মনে হচ্ছে শুধু বারান্দায় জোছনা হয়েছে। আর কোথাও নয়।

টেলিফোন বাজছে। ওঠে ধরতে ইচ্ছা করছে না। অনেক রাতে খুব আজে বাজে

ধরনের কল আসে। আবার মারুফও মাঝ রাত ছাড়া টেলিফোন করে না। ষাট ভাগ সম্ভাবনা কুৎসিত মানসিকতার কোন মানুষ টেলিফোন করেছে। তিথি টেলিফোন ধরা মাত্র সে বলবে, আপা এত রাত পর্যন্ত জেগে আছেন কেন? কি করছেন? তারপরই শুরু করবে অশ্লীলতম কিছু কথা বার্তা।

আবার চল্লিশভাগ সম্ভাবনা হল — মারুফ টেলিফোন করেছে। টেলিফোন না ধরা মানে সেই সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করা। তিথি তা পারবে না। তিথি কেন কোন মেয়েই পারবে না। তিথি টেলিফোন ধরে ভয়ে ভয়ে বলল,

'হ্যালো।'

'তিথি?'

'হুঁ।'

'তোমাদের টেলিফোন নষ্ট না-কি বলতো? সন্ধ্যাবেলা অনেকবার চেষ্টা করলাম।'

'সন্ধ্যাবেলা টেলিফোনের লাইন খোলা ছিল।'

'ও আচ্ছা। তুমি এখনো ঘুমাও নি?'

'না।'

'করছিলে কি?'

'বারান্দায় বসে জোছনা দেখছিলাম।'

'জোছনা আছে না-কি?'

'হুঁ।'

'তোমার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে খুব ক্লান্ত।'

'কিছুটা ক্লান্ততো বটেই। অনেক কাজ করলাম। রান্না বান্না ঘর গোছানো।'

'তোমার মা এখনো আসেন নি?'

'উহুঁ।'

'তোমার মা-কি খুব রাগী মহিলা? তাঁকে দেখে কিন্তু মনে হয় না।'

'মা মোটেই রাগী মহিলা না। তাঁর সব রাগ শুধু বাবার উপর। আর কারো উপর তাঁর কোন রাগ নেই।'

'তোমার মা'র প্রসঙ্গে কথা তোলায় তুমি আবার রাগ করনিতো?'

'না। আমার সবচে ভাল গুন হল আমি কখনো রাগ করি না।'

'কারো উপর তোমার রাগ হয় না?'

'হয়। তবে আমার একটা টেকনিক আছে। ঐ টেকনিক ব্যবহার করে রাগটাকে অভিমানে নিয়ে যাই। তারপর খানিকক্ষণ কাঁদি। অভিমান দূর হয়ে যায়।'

'তুমি দেখি একেবারে বইয়ের ভাষায় কথা বলছ — সত্যি কি এরকম কর?'

'হ্যাঁ করি।'

'কি ভাবে কাঁদো? ভেউ ভেউ করে না নিঃশব্দ কান্না?'

'ছোট বেলায় ভেউ ভেউ করেই কাঁদতাম। এখন নিঃশব্দে কাঁদতে চেষ্টা করি। পারি না। কি করি জান — বাথরুমে ঢুকে যাই। আমার একটা খুব নরম নীল রঙের তোয়ালে আছে ঐ তোয়ালেতে মুখ ঢেকে কাঁদি। যাতে কান্নার শব্দ কেউ শুনতে না পারে।'

'পানির ট্যাপ ছেড়ে রাখলেই হয়। পানি পড়ার শব্দে কান্নার শব্দ ঢাকা পড়ার কথা।'

তিথি হাসতে হাসতে বলল, আমার হচ্ছে নীল তোয়ালে টেকনিক। সবার টেকনিকতো এক রকম না।

'তোমার কি ঘুম পাচ্ছে তিথি?'

'না।'

'সারারাত, কথা বলতে পারবে?'

'অন্য কারো সঙ্গে পারব না — তবে তোমার সঙ্গে পারব।'

'বেশ আজ তাহলে সারারাত কথা বলব। কত মানুষ কত ধরণের রেকর্ড করে। আমরা সারারাত ননষ্টপ কথা বলে রেকর্ড করব। রাজি আছ?'

'আছি।'

'বেশ তাহলে শুরু করা যাক — প্রথম বাক্যটি কি আমি বলব?'

'বল।'

'তুমি এত ভাল কেন তিথি?'

তিথির চোখে পানি এসে গেল। টেলিফোনের এই এক সুবিধা কথা বলতে বলতে চোখে পানি এসে গেলেও ও পাশের মানুষটা বুঝতে পারবে না।

'হ্যালো তিথি, হ্যালো — আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো . . .'

তিথি বলল, শুনতে পাচ্ছি।

'হ্যালো, হ্যালো তিথি — হ্যালো . . .'

'আমি তো তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি। পরিস্কার শুনতে পাচ্ছি।'

'তিথি তিথি . . .'

ওপাশ থেকে অনেকক্ষণ হ্যালো হ্যালো শোনা গেল। টেলিফোনের খট্‌খট্ শব্দ হল, তারপর পুরোপুরি নিঃশব্দ। নষ্ট টেলিফোন থেকে শোঁ শোঁ যে আওয়াজ হয় তাও হচ্ছে না।

তিথি আবারও বারান্দায় এল। এখন আর চাঁদটা দেখা যাচ্ছে না। আর্কিটেক্ট বাড়ি ডিজাইন করার সময় পূর্ব-পশ্চিম কত কিছু খেয়াল করেন। কোন দিকে রোদ

আসবে, কোন দিকে আসবে না সব তাঁদের নখদর্পণে . . . কিন্তু চাঁদের আলো সম্পর্কে তারা কিছু ভাবেন না কেন? চাঁদটা কি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ না? এমন একটা বারান্দা কি তাঁরা বানাতে পারেন না যেখানে যতক্ষণ চাঁদ থাকবে ততক্ষণ চাঁদের আলো থাকবে?

তিথির হাই ওঠছে — বিছানায় যেতেও ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে, আজ রাতে তার ঘুম হবে না। তাকে জেগে থাকতে হবে। তিথি নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। বাথরুমে গা ধোল। শীত নেমে গেছে। পানি কনকনে ঠাণ্ডা। ইচ্ছা করলেই গরম পানি মিশিয়ে নিতে পারে। ইচ্ছা করছে না। শরীরে এক ধরনের যন্ত্রণা হচ্ছে। এই যন্ত্রণা দূর করতে ঠাণ্ডা পানি লাগবে।

বিছানায় শুতে গিয়ে তার মনে হল — দাদাজানের চিঠিটা পড়া হয়নি। খাবার ঘরের টেবিলে চিঠিটা পড়ে আছে। চিঠির যদি প্রাণ থাকত তাহলে সে নিশ্চয়ই বলত, এই যে তিথি, এখনও তুমি আমাকে পড়ছ না কেন? এত কিসের অবহেলা? তিথির গায়ে নাইটি। এমন একটা স্বচ্ছ পোশাকে কি খাবার ঘরে যাওয়া ঠিক হবে? যদি হুট করে ঐ লোকটা খাবার ঘরে ঢুকে পড়ে? এই পোশাকে তাকে দেখলে লোকটা কি ভাববে কে জানে? হয়ত তার ছোটখাট একটা স্ট্রোক হয়ে যাবে।

বসার ঘরে কেউ নেই। তিথি চিঠি নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে গেল। তিথির দাদাজান লিখেছেন —

তিথি সোনামণি,

বয়সের একটি পর্যায়ে মানুষ পরিত্যক্ত হয়। আমি সেই পর্যায়ে পৌঁছিয়াছি। আমার সঙ্গ এখন সবার বিরক্তি উৎপাদন করে। নিজের পুত্র কন্যারাও এখন আর আমার পত্রের জবাব দেয় না। তাহারা পত্র পাঠ করে কি-না সেই বিষয়েও আজ আমার সন্দেহ হয়। তোমার বাবাকে গত চার মাসে মোট ছয়টি পত্র দিয়াছি। সে একটিরও জবাব দেয় নাই।

তোমার কথা স্বতন্ত্র। গত চার মাসে তোমাকে আমি তিনটি পত্র দিয়াছি। তুমি তিনটিরই যে শুধু জবাব দিয়াছ তাই না — নিজ থেকেও একটি পত্র লিখিয়াছ। তোমার পত্রগুলি বার বার করিয়া পড়িয়াছি এবং বড়ই তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

তোমার পত্রপাঠে মনে হয়, তুমি তোমার জীবন নিয়া বড়ই চিন্তিত। এত চিন্তিত হইবার কিছু নাই। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে। আল্লাহপাক মানুষকে সীমিত স্বাধীন সত্তা দিয়া পাঠাইয়াছেন। আমাদের কাজ করিতে হইবে এই সীমিত স্বাধীনতায়। মূল চাবিকাঠি

তাঁহার হাতে। কাজেই এত চিন্তা করিয়া কি হইবে? যাহা হোক, আমি তোমাকে আধ্যাত্মবাদ শিখাইতে চাই না। সব কিছুরই একটা সময় আছে। আমি শুধু তোমাকে মন স্থির রাখিবার উপদেশ দিতেছি। মনকে কাঁটা কম্পাসের মত হইতে হইবে। কম্পাসের কাঁটা সাময়িকভাবে নাড়া খাইতে পারে তবে তাহার দিক কিন্তু ঠিকই থাকে।

এক্ষণে অন্য একটি বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। নুরুজ্জামান ছেলেটিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য কর। আমার অত্যন্ত পছন্দের ছেলে। তাহার কাজকর্ম নির্বোধের ন্যায়। তবে সে নির্বোধ নয়। তাহার মন কম্পাসের কাঁটার ন্যায় স্থির। এই সমাজে যাহা সচরাচর দেখা যায় না। তুমি গত চিঠিতে জানিতে চাহিয়াছিলে কোন ধরনের ছেলে তোমার বিবাহ করা উচিত। নুরুজ্জামান হচ্ছে সেই ধরনের ছেলে। আমার ধারণা, নুরুজ্জামানের মত কোন একজনের সঙ্গে তোমার বিবাহের ফল অত্যন্ত শুভ হইবে। আমি সরাসরি নুরুজ্জামানের কথাও বলিতে পারিতাম, বলিলাম না কারণ তোমাদের বাস্তবতা আমি জানি। আমার পত্রপাঠে রাগ করিও না বা বিরক্তও হইও না।

আমি যাহা ভাল বিবেচনা করিয়াছি তাহাই বলিয়াছি। . . .

বাকি চিঠি আর পড়তে ইচ্ছে করছে না। তিথি চিঠিটা দলা পাকিয়ে কাবার্ডের দিকে ছুঁড়ে মারল। দাদাজানের বুদ্ধি-শুদ্ধি কি পুরোপুরিই গেছে?

জাফর সাহেবের ঘরে এয়ারকুলার সারাবার মিস্ত্রী এসেছে। গোটা ভাদ্রমাস এয়ারকুলার বন্ধ ছিল। দেন-দরবার করেও মিস্ত্রী পাওয়া যায় নি। এখন শীত পড়ে গেছে। বিকেলে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে রীতিমত ঠাণ্ডা লাগে, আর এখন কি-না এসেছে এয়ারকুলার ঠিক করতে। তাঁর ইচ্ছা করছে মিস্ত্রী দু'জনকেই ঘাড় ধরে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে রাখতে। বাথরুমের শাওয়ারটা খুলে দিতে পারলে ভাল হত। সারাক্ষণ শাওয়ারের পানিতে ভিজুক। সব ইচ্ছা পূর্ণ হবার নয়। অপরিচিত কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা তাঁর ধাতে নেই। খারাপ ব্যবহার শুধু মাত্র প্রিয় এবং পরিচিতজনদের সঙ্গেই করা যায়। তিনি মিস্ত্রী দু'জনের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, চা খাবেন?

দু'জন একসঙ্গে বলল, খামু স্যার।

এদের আসার পর থেকেই জাফর সাহেব দেখছেন, এদের মতের মিল হচ্ছে না। একজন এক রকম করতে বলছে তো অন্যজন আরেক রকম বলছে। চা খাবার প্রশ্নে দু'জনকেই তাৎক্ষণিকভাবে একমত হতে দেখা গেল। জাফর সাহেব চায়ের কথা বললেন। তিনি কাজে মন বসাতে পারছেন না। প্রায় দু'শ পৃষ্ঠার এক গাবদা ফাইল তাঁর সামনে পড়ে আছে। আজ দিনের মধ্যে ফাইল পড়ে নোট দিতে হবে। পড়ায় মন বসছে না। মিস্ত্রী দু'জন বিরক্ত করছে। অন্য কোথাও বসে যে কাজ করবেন সেই উপায় নেই। তিনি নিজের ঘর ছাড়া বসতে পারেন না। দম আটকে আসে।

জাফর সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, আপনাদের কাজ শেষ করতে কতক্ষণ লাগবে?

'ধরেন খুব বেশি হইলে আধা ঘণ্টা।'

জাফর সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, আধঘণ্টা অপেক্ষা করা যেতে পারে। এই ফাঁকে শায়লার সঙ্গে কি কথা বলে নেবেন? বিনীত ভঙ্গিতে বলবেন, "সব

অপরাধ আমার। বাসায় ফিরে আস।" দু'টি মাত্র বাক্য, বলা কঠিন হবার কথা না। "সব অপরাধ আমার" — এই বাক্যটা বলাটাই সমস্যা। তিনি জানেন, সব অপরাধ তাঁর না। এটা বলা মানে মিথ্যা কথা বলা।

মিথ্যা বলা মানে আত্মার ক্ষয়। জন্মের সময় মানুষ বিশাল এক আত্মা নিয়ে পৃথিবীতে আসে। মিথ্যা বলতে যখন শুরু করে তখন আত্মা ক্ষয় হতে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে দেখা যায়, আত্মার পুরোটাই ক্ষয় হয়ে গেছে। জাফর সাহেব সতেরো বছর বয়সের পর থেকে আত্মার ক্ষয়রোধ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। মানুষের সব চেষ্টা সফল হয় না। এটিও হচ্ছে না। পদে পদে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন। শায়লার সঙ্গে প্রায়ই মিথ্যা বলতে হচ্ছে। এই যে তিনি বলবেন, 'সব অপরাধ আমার' এতে আত্মার অনেকটা ক্ষয় হবে।

জাফর সাহেব টেলিফোনের ডায়াল ঘুরালেন। তাঁর মেজো মেয়ে ইরা ধরল। হাসি-খুশি গলা। বাড়ি ছেড়ে এই যে এতদিন বাইরে আছে তার কোন রকম ছাপ মেয়ের গলায় নেই।

'হ্যালো বাবা, কেমন আছ?'

'ভাল।'

'তুমি কি অফিস থেকে টেলিফোন করছ?

'হুঁ।'

'বাবা শোন, আমরা সিলেট বেড়াতে যাচ্ছি। ছোট মামার চা বাগানে।'

'কবে যাবি?'

'আজ রাতের ট্রেনে, সুরমা মেইল। মামা বলছিল গাড়িতে করে যেতে। বাই রোড। মা রাজি হল না।'

'ও আচ্ছা।'

'বাবা শোন, তুমি আমাদের সামনের মাসের হাত খরচের টাকাটা এডভান্স দিতে পারবে? একদম খালি হাতে সিলেট যাচ্ছি তো। ভাল লাগছে না।'

'ক'দিন থাকবি?'

'ক'দিন থাকব বলতে পারছি না। মা যতদিন থাকতে চায় ততদিন। বাবা, তুমি হাত-খরচের টাকা দেবে কি দেবে না তা তো বললে না?'

'পাঠিয়ে দেব।'

'থ্যাংকস।'

'তোর মা কি আছে?'

'আছে। কথা বলবে?'

'হুঁ।'

'ধর তুমি, ডেকে দিচ্ছি। তবে মা তোমার সঙ্গে কথা বলবে কি–না তা তো জানি না। মনে হয় বলবে না। যা রেগে আছে!'

'তুই ডেকে দে।'

'আচ্ছা।'

জাফর সাহেব টেলিফোন হাতে বসে আছেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, মিস্ত্রী দু'জন কাজ ফেলে হা করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। টেলিফোনের কথা শুনছে। এই দু'টার মাথা কামিয়ে দিলে কেমন হয়? শায়লার গম্ভীর গলা পাওয়া গেল —

'হ্যালো।'

জাফর সাহেব বললেন, কেমন আছ?

'আমি কেমন আছি সেটা দিয়ে তোমার দরকার নেই। কি বলতে চাচ্ছ বল।'

'সিলেট না–কি যাচ্ছ?'

'কেন — কোন অসুবিধা আছে? স্বামীর অনুমতি ছাড়া নড়তে পারব না।'

'অনুমতির কথা তো আসছে না। যেতে চাচ্ছ যাবে।'

শায়লা গম্ভীর গলায় বললেন, রাখি?

'শোন শায়লা, হ্যালো — আমি অনেক ভেবে–টেবে দেখলাম, অপরাধটা আসলে আমার। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি, সংসারে চলার পথে . . . '

খট্ করে শব্দ হল। শায়লা টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। জাফর সাহেবের দিকে মিস্ত্রী দু'জন এখনো তাকিয়ে আছে। তিনি এমন ভাব করলেন যেন টেলিফোনে খুব আনন্দজনক সংবাদ পেয়েছেন। তিনি হাসিমুখে বললেন, আপনার কাজ কতদূর?

'কাজ বন্ধ স্যার।'

'বন্ধ কেন?'

'পার্টস নাই।'

'পার্টস নাই, তাহলে শুধু শুধু বসে আছেন কেন?'

'স্যার চলে যাব?'

'অবশ্যই চলে যাবেন। এক থেকে পাঁচ গুনার আগেই যাবেন। ওয়ান টু থ্রি ফোর . . . .'

'মেশিনটা জায়গায় ফিট কইরা থুইয়া যাই?'

'নো। এক্ষুণি বিদায় হতে হবে। রাইট নাউ।'

জাফর সাহেব বুঝতে পারছেন তাঁর রাগ বিপদসীমা অতিক্রম করতে যাচ্ছে। এক্ষুণি ভয়াবহ কিছু হবে। এদের উপর রাগ করাটা অর্থহীন। স্ত্রীর উপর রাগ তিনি এদের উপর ঝাড়তে পারেন না . . .

এমন এক বিপজ্জনক মুহূর্তে নুরুজ্জামান দরজা ঠেলে মাথা বের করে বলল,

স্যার আসি?

জাফর সাহেব থমথমে গলায় বললেন, কি ব্যাপার!

'কোন ব্যাপার না স্যার। আপনার অফিসের ঠিকানা ছিল। ভাবলাম দেখা করে যাই। মৌচাক মার্কেটে যাচ্ছিলাম।'

'আমার সঙ্গে কি কোন দরকার আছে?'

'জ্বি-না স্যার।'

'তাহলে এলে কেন?'

নুরুজ্জামান ভয়ে ভয়ে বলল, মন্ত্রী সাহেবের পিএ-র সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি আবার নেত্রকোনায় বিবাহ করেছেন।

'উনি নেত্রকোনা বিয়ে করেছেন তাতে কি হয়েছে?'

'যোগাযোগের একটা সুবিধা হয়ে গেল।'

জাফর সাহেব হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এতটা নির্বোধ কোন সুস্থ মানুষ হতে পারে তা তাঁর ধারণায় নেই। চতুষ্পদরা এরচে কিছু বেশি বুদ্ধি ধরে।

নুরুজ্জামান বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সামনের চেয়ারে বসেছে। জাফর সাহেব যে রেগে আগুন হয়ে আছেন তাও তার মাথায় ঢুকছে না। নুরুজ্জামান উৎসাহের সঙ্গে বলল, পি এ সাহেবের বাসায় একদিন চলে যাব। একটা ব্যবস্থা তখন হবেই।

'হুট করে একজন অপরিচিত মানুষের বাসায় উঠে যাবে?'

'হুট করে যাব না। আগে টেলিফোন করব। টেলিফোন নাম্বার নিয়ে এসেছি।'

জাফর সাহেব লক্ষ্য করলেন নুরুজ্জামান টেলিফোন সেটটার দিকে তাকাচ্ছে। মনে হচ্ছে এখান থেকে টেলিফোন করবে এই মতলব করেই এসেছে। এই যদি মতলব হয় তাহলে তাকে খুব নির্বোধ বলা যাবে না। জাতে মাতাল হলেও তালে ঠিক আছে।

'স্যার একটা টেলিফোন করব?'

'কাকে করবে পি এ সাহেবের স্ত্রীকে?'

'জ্বী না। আমাদের দেশের একজন মানুষ আছে রামপুরায় বাসা। উনি আমাকে একটা সুযোগ করে দিবেন বলেছিলেন।'

'কিসের সুযোগ?'

'বাঁশি বাজাবার সুযোগ। টিভিতে বাঁশি বাজাব।'

'তুমি বাঁশি বাজাতে জান?'

'পাতার বাঁশি স্যার। দু'টা পাতা ভাজ করে ঠোটের ভেতর দিয়ে . . .'

'নুরুজ্জামান।'

'জ্বী স্যার।'

'আমি এখন অত্যন্ত জরুরি একটা কাজ করছি। আমার মন মেজাজও ভাল নেই — তুমি যাও।'

'জ্বী আচ্ছা স্যার।'

জাফর সাহেব লক্ষ্য করলেন, নুরুজ্জামান তাঁর কথায় দুঃখিতও হল না। আপমানিতও বোধ করল না। হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল। সহজ গলায় বলল, স্যার বাসায় ফিরবেন কখন?

'কেন?'

'বাসায় ফেরার সময়টা জানা থাকলে এখানে চলে আসতাম তারপর আপনার সাথে একসঙ্গে গাড়িতে চলে যেতাম। গাড়িতে চড়ার মজাই অন্যরকম।'

'আমি পাঁচটার সময় বাসায় যাব।'

'জ্বী আচ্ছা স্যার। আমি চলে আসব।'

জাফর সাহেবের মাথা দপদপ করছে। জ্বর এসে গেছে কি-না কে জানে। বমি বমি ভাব হচ্ছে। অতিরিক্ত মেজাজ খারাপ হলে তাঁর এমন বমি বমি ভাব হয়।

নুরুজ্জামান বলল, স্যার যাই। স্লামালিকুম।

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

জাফর সাহেব ফাইল সামনে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। মেজাজ এতই খারাপ যে ফাইলের দিকেও তাকাতে পারছেন না। অথচ পুরো ফাইল আজ দিনের মধ্যেই দেখে দিতে হবে।

ঝাঁ ঝাঁ রোদে নুরুজ্জামান হাঁটছে। এমন ভাবে হাঁটছে যেন এই শহরটা তার খুবই পরিচিত। তার প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে। দুপুরে এখনো কিছু খাওয়া হয় নি। এক হোটেলে খেতে বসেছিল। দাম শুনে বুক ধড়ফড় শুরু হল। এক পিস মাছ কুড়ি টাকা। ভাত ফুল প্লেট পাঁচ টাকা পরের হাফ দু' টাকা ডাল এক বাটি পাঁচ টাকা। একবেলা খেতেই বত্রিশ টাকা। অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই এক কাপ চা খেয়ে সে বের হয়ে এসেছে। চায়ের দামও নিল দু' টাকা। টাকাটা একেবারে পানিতে পড়ে গেছে। এতটুক কাপে এক কাপ চা এর দাম দু' টাকা, পাগলের দেশ না-কি? টেলিফোন করতে গিয়েও পাঁচ টাকা নষ্ট হল। ফার্মেসী থেকে টেলিফোন করেছিল। এরা কল প্রতি তিনটাকা নেয়। পাঁচ টাকার একটা নোট দিল। তারা নোটটা রেখে দিয়ে বলল, ভাংতি নাই। আরেক সময় এসে আরেকটা টেলিফোন করে যাবেন। এখন যান। বিরক্ত করবেন না।

নুরুজ্জামান একবার ভাবল বলে, টাকাটা দিন আমি ভাংতি করে দেই। শেষ পর্যন্ত বলল না। এই লোকের মুখ দেখে মনে হচ্ছে বললেও লাভ হবে না।

নুরুজ্জামান এখন যাচ্ছে মৌচাকের দিকে।

ভরদুপুরে কারোর বাসায় উপস্থিত হওয়া ঠিক না, কিন্তু খবর পাওয়া গেছে কামরুদ্দিন সাহেব বাসায় খেতে যান। তাঁকে ধরার এইটাই উৎকৃষ্ট সময়।

নুরুজ্জামান দু'টা আনারস কিনল। এই সময় আনারস পাবার কথা না। ঢাকা শহরের ব্যাপার-ট্যাপার সবই অদ্ভুত। আনারস পাওয়া যাচ্ছে।

বাচ্চা-কাচ্চার বাসা, খালি হাতে যাওয়া ঠিক না।

কামরুদ্দিন সাহেব বাসাতেই ছিলেন। দুপুরের খাওয়া শেষ করে পান মুখে দিয়েছেন। তাঁর দুপুরে কিছুক্ষণ ঘুমানোর অভ্যাস — এই সময়ে দরজা খুলতে হল। নুরুজ্জামান হাসিমুখে বলল, স্যার চিনতে পারছেন? আমি নুরুজ্জামান।

কামরুদ্দিন বললেন, কি ব্যাপার?

'বলেছিলেন ঢাকায় এলে যেন দেখা করি।'

'এখন তো একটু ব্যস্ত আছি।'

'তাহলে স্যার পরে আসি?'

'আচ্ছা আসুন, পরে আসুন।'

'আমাকে চিনতে পারছেন তো স্যার? — পাতার বাঁশি। বলেছিলেন একটা ব্যবস্থা করে দিবেন।'

'হুঁ।'

'বাচ্চা-কাচ্চার জন্যে দু'টা আনারস এনেছিলাম।'

কামরুদ্দিন বিরক্তমুখে আনারস হাতে নিলেন। নুরুজ্জামান বলল, কবে আসব স্যার?

'আসুন, কাল আসুন। বাসায় না, অফিসে আসুন। বাসায় লোকজন আসা আমি পছন্দ করি না। দশটার দিকে অফিসে আসুন।'

'টিভি ভবনে?'

'হ্যাঁ। গেটে পাশ থাকবে। নাম যেন কি বললেন?'

'নুরুজ্জামান। মুহম্মদ নুরুজ্জামান। পাতার বাঁশি কি সঙ্গে করে নিয়ে আসব স্যার?'

'আনুন।'

'তাহলে আজ স্যার যাই। কাল দেখা হবে। আমি ঠিক দশটার সময় চলে আসব স্যার।'

'আচ্ছা।'

কামরুদ্দিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আগামী কাল তিনি টিভি ভবনে যাচ্ছেন

না। অন্য কাজ আছে। এই লোক কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে চলে যাবে। তাঁর কপাল ভাল হলে আর আসবে না। কপাল মন্দ হলে আবারও আসবে। জীবন অস্থির করে দেবে। কামরুদ্দিন সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন, নির্বোধ লোকের সংখ্যা এত দ্রুত বাড়ছে — এর কারণ কি?

নুরুজ্জামান আবার হাঁটতে শুরু করেছে। হাঁটতে তার ভাল লাগছে। ঢাকা শহরে হেঁটে বেড়ানোর আলাদা মজা। কত কিছু আছে দেখার। এত ব্যস্ত রাস্তায় এক গেঞ্জী-গায়ে লোককে দেখা গেল ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলে গেল। দুবলা-পাতলা ঘোড়া না, বেশ তরতাজা ঘোড়া। শহরের রাস্তায় ঘোড়াটাকে মানাচ্ছে না, আবার গেঞ্জী-গায়ে লোকটাকেও ঘোড়ার পিঠে মানাচ্ছে না। তারপরেও পুরো ব্যাপারটা মানিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে ঘোড়ার পিঠে এই মানুষটার দরকার ছিল।

নুরুজ্জামান ঘড়ি দেখল। দু'টা ত্রিশ। তার ঘড়ি পাঁচ মিনিট ফাস্ট আছে। আসল সময় দু'টা পঁচিশ। পিএ সাহেবের বাসায় কি চলে যাবে? ঠিকানা আছে, যাওয়া যায়। দুপুর বেলা উপস্থিত হলে উনি কি রাগ করবেন? করতে পারেন। করাটাই স্বাভাবিক। তবু চেষ্টা করতে দোষ কি? উনার বাসা কলাবাগান। ঐদিকে বাস যায় কিনা খোঁজ করতে হবে। হেঁটে রওনা দেয়াটা ঠিক হবে না। বাসের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আজ না-কি বাস স্ট্রাইক। নুরুজ্জামান হাঁটা শুরু করল।

কলিংবেল টিপতেই একজন মহিলা দরজা খুলে দিলেন, নুরুজ্জামান বলল, স্লামালিকুম আপা।

'ওয়ালাইকুম সালাম। উনি তো বাসায় নেই।'

'আপা, আমি আপনার কাছে এসেছি। আমার নাম নুরুজ্জামান। আমি অতিথপুর গার্লস স্কুলের হেডমাস্টার। আমি এক গ্লাস পানি খাব।'

'আপনি তো ঘামে ভিজে জবজবা হয়ে গেছেন। আসুন, ফ্যানের নিচে আসুন।'

নুরুজ্জামান বসার ঘরে বসল। মহিলা তাকে পানি দিলেন না, এক গ্লাস সরবত এনে দিলেন। সরবতের উপর বরফের টুকরা ভাসছে। ভদ্রমহিলা বললেন, এক্ষুনি খাবেন না। একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিন।

'আমার একটু শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা দরকার। কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না আপা।'

'আচ্ছা, আমি বলে দেব। ও ব্যবস্থা করে দেবে।'

'আপা, আপনার অনেক মেহেরবানী। এখন পানিটা খাই।'

'খান।'

নুরুজ্জামান এক নিঃশ্বাসে সরবতের গ্লাস শেষ করে বরফের টুকরা চিবাতে

লাগল। দাঁত দিয়ে বরফ ভাঙার কচকচ শব্দ হচ্ছে। ভদ্রমহিলা বললেন, আরেক গ্লাস এনে দেই?

'জ্বি আচ্ছা।'

'আপনি একটা কাগজে আপনার নাম-ঠিকানা লিখে দিন। ও একটা পাশ দিয়ে রাখবে। আপনি সেক্রেটারীয়েটে ঢুকে ওর সঙ্গে দেখা করবেন। ও নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করবে।'

'কবে?'

'আগামীকাল দশটায় আসুন।'

'জ্বি না। আগামীকাল আসতে পারব না। আগামীকাল টিভিতে আমার একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা। উনার নাম কামরুদ্দিন। উনি আমাকে একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দিবেন। পাতার বাঁশি। আমি পাতার বাঁশি বাজাই।'

'ও আচ্ছা। তাহলে একটা কাগজে আপনার নাম-টাম লিখে দিন। কোন টেলিফোন নাম্বার কি আছে যাতে ও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে?'

'জ্বি আছে।'

'টেলিফোন নাম্বার লিখে রেখে যান। ও আপনার সঙ্গে কথা বলে একটা এপয়েন্টমেন্ট করবে।'

'আপা, তাহলে উঠি।'

'আরেক গ্লাস পানি খাবার কথা না? বসুন, পানি নিয়ে আসি।'

'তৃষ্ণা চলে গেছে আপা।'

নুরুজ্জামান হাসছে। ভদ্রমহিলাও হাসছেন। বিদায় নেবার সময় ভদ্রমহিলাকে পুরোপুরি হকচকিয়ে দিয়ে নুরুজ্জামান তাঁকে কদমবুসি করে ফেলল। নুরুজ্জামানের পকেট থেকে সানগ্লাস, চাবির রিং এবং ভাংতি পয়সা গড়িয়ে পড়ল।

তিথি দুপুরে দু'জনের জন্যে ভাত রেঁধেছিল। সে আর নুরুজ্জামান। জাফর সাহেব দুপুরে বাসায় খেতে আসেন না। কেনটিন থেকে একটা স্যাণ্ডউইচ আর কলা এনে খান।

নুরুজ্জামান দুপুরে আসেনি। এক গাদা ভাত ফ্রীজে ঢুকিয়ে রাখতে হয়েছে। ফেলতে মায়া লাগছে বলেই ফ্রীজে ঢুকিয়ে রাখা। সে ভাল করেই জানে শেষ পর্যন্ত ফেলে দিতে হবে। ফ্রীজের ভাত গরম করলে কেমন শক্ত হয়ে যায়। চিবানো যায় না। ন'তলায় কোন ভিখিরী আসে না। কাজেই ভিখিরীকে ভাত দিয়ে দেয়ারও প্রশ্ন আসে না। ফ্রীজের ঠাণ্ডা ভাত গরম করারও হয়ত কোন কায়দা আছে। সে তা

জানে না। মা নিশ্চয়ই জানেন। তিথি ঠিক করে রেখেছে মা'কে টেলিফোনে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করবে। এটা আসলে তার একটা অজুহাত। মা'র সঙ্গে কথা বলার অজুহাত।

টেলিফোন সেই যে কাল রাতে নষ্ট হয়েছে এখনো ঠিক হয়নি। পাশের ফ্ল্যাট থেকে মা'কে টেলিফোন করতে হবে। নীলক্ষেত এক্সচেঞ্জেও জানাতে হবে। অফিসে যাবার সময় বাবাকে বলে দিলে তিনি একটা ব্যবস্থা করতেন। বাবাকে বলার কথা তিথির মনে পড়েনি।

একা একা ভাত খাওয়ার মত খারাপ ব্যাপার আর হয় না। একমাত্র পশুরাই খাবার একা খেতে পছন্দ করে। মানুষ পারে না।

দুপুরে তিথি খানিকক্ষণ ঘুমুলো। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল, টেলিফোন ঠিক হয়ে গেছে। মারুফ কথা বলছে। মারুফ বলছে — শোন তিথি, পশুর সঙ্গে মানুষের সবচে' বড় তফাৎ হল — মানুষ দল-বল নিয়ে খেতে পছন্দ করে। পশু তার খাবার নিয়ে একা একা চলে যায়। এমনভাবে খায় যেন কেউ দেখতে না পারে।

তিথি বলল, পাখিদের বেলায় কি হয়?

পাখিদের জন্যেও একই ব্যাপার। শুধু খাঁচায় বন্দি পাখিদের একসঙ্গে খেতে হয় কারণ তাদের উপায় নেই। ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

তিথি বলল, ক্রিং ক্রিং শব্দ হচ্ছে কেন?

মারুফ বলল, বুঝতে পারছি না। বোধহয় তোমাদের বাসায় কলিংবেল বাজছে।

'দরজা খুলে দেব?'

'দরজা খোলার কোন দরকার নেই। তুমি ঘুমুতে থাক। যে এসেছে সে খানিকক্ষণ বেল বাজিয়ে চলে যাবে।'

'ক্রিং ক্রিং ক্রিং।'

তিথির ঘুম ভাঙল। কলিং বেল না, টেলিফোন বাজছে। ঘুমের ঘোর তার এখনো কাটেনি। সে জড়ানো গলায় বলল, হ্যালো।

ওপাশ থেকে শায়লা বললেন, তোদের টেলিফোন নষ্ট না-কি? সকাল থেকে টেলিফোন করছি, লাইন পাচ্ছি না।

'টেলিফোন নষ্ট ছিল মা। এখন ঠিক হয়েছে। তুমি কেমন আছ?'

'ভাল। শোন্, আমরা সিলেট যাচ্ছি।'

'কবে?'

'আজ রাতের ট্রেনে, সুরমা মেল। তোর ছোট মামার চা বাগান দেখে আসি। তুই যাবি?'

'অবশ্যই যাব।'

'তাহলে তোর কাপড়-চোপড় গুছিয়ে এখানে চলে আয়। আমি এক ঘণ্টা পরে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। আমার ঘরে পরার কয়েকটা শাড়ি সঙ্গে নিয়ে আসবি — আর কাবার্ডের নিচে রাখা স্যাণ্ডেল জোড়া আনবি।'

'ইটালীয়ান স্যাণ্ডেল?'

'হ্যাঁ।'

'ক' দিন থাকবে?'

'ঠিক নেই। চার-পাঁচ দিন থাকতে পারি।'

'বাবাকে তাহলে এক সপ্তাহের ছুটি নিতে বলি?'

'ওর ছুটি নেয়া-নেয়ির কি আছে?'

'বাবা কি সঙ্গে যাচ্ছে না?'

'না।'

'সে-কি!'

'তুই মনে হয় আকাশ থেকে পড়লি।'

'বাবা একা-একা থাকবে?'

'হ্যাঁ থাকবে। সে কচি খোকা না। তাকে ফিডিং বোতল দিয়ে দুধ খাওয়াতে হয় না।'

'বাবা একা থাকবে আর আমরা দল বেঁধে বেড়াতে যাব?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে মা তোমরা যাও, আমি যাব ন।'

'তুই যাবি না?'

'না। এবং মা আমার মনে হয় — তুমি বাড়াবাড়ি করছ।'

'আমি বাড়াবাড়ি করছি না। তুই বাড়াবাড়ি করছিস। আমি তোর বাবাকে একটা কঠিন শিক্ষা দিতে চাচ্ছি — তোর জন্যে পারছি না।'

'কঠিণ শিক্ষা শুধু বাবার একার হবে কেন? তোমারও তো হওয়া উচিত।'

'তুই কি বললি?'

'রাগ করো না, মা।'

'যার যা ইচ্ছা আমাকে বলে যাবে আর আমি রাগ করব না?'

'মা শোন, চল আমরা সিলেট থেকে ঘুরে আসি। অনেক দিন ফ্ল্যাট বাড়িতে থেকে থেকে আমাদের মন-টন ছোট হয়ে গেছে। বাইরে ঘুরলে ভাল লাগবে। বাবাও আমাদের সঙ্গে যাক। তুমি তাঁর সঙ্গে কথা বলো না — তাহলেই হল। তুমি এমন ভাব করবে যেন বাবা একজন অপরিচিত মানুষ।'

'আমার সঙ্গে চাল চালবি না তিথি।'

'আমি কোন চাল চালছি না মা।'

'আমি তোর বাবাকে এমন শিক্ষা দেব যে সে তার নিজের নাম পর্যন্ত ভুলে যাবে। তার এত বড় সাহস, সে আমার গায়ে হাত তুলে . . .।'

'সে কি'

'এখন দেখি একবারে আঁৎকে উঠলি। তোর বাবা এলে তাকে জিজ্ঞেস করিস, তারপর তুই তোর বাবার হয়ে ওকালতি করিস। তার আগে না।'

তিথি চুপ করে রইল, টেলিফোনের ওপাশ থেকে কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তিথি কি করবে বুঝতে পারছে না। তিথি নরম করে ডাকল, 'মা।'

'কি?'

'ফ্রীজের ঠাণ্ডা ভাত কি করে গরম করতে হয়?'

'জানি না। চুপ কর।'

শায়লা টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

পাঁচটা বেজে গেছে। জাফর সাহেবের আসার সময় হয়ে গেল। বিকেলে নাশতা দেয়ার মত কিচ্ছু নেই। ময়দা আছে, লুচি ভেজে দেয়া যায়। ঘরে ডিম আছে। ডিমের ওমলেট আর লুচি ভাজা।

তিথি অনেক খুঁজেও লুচি বেলার বেলুন পেল না। একটা টিন ভর্তি চিড়া আছে। তার মুখ খুলে দেখা গেল কাল কাল পোকা পড়ে গেছে। তিথির অস্থির লাগছে। বাবা ক্ষুধার্ত হয়ে অফিস থেকে ফেরেন। হাত-মুখ ধুয়েই কিছু খাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁকে দেয়ার মত কিছুই নেই।

তিথি চায়ের পানি চড়াল।

জাফর সাহেব এলেন সাড়ে পাঁচটার দিকে। নুরুজ্জামান তাঁর সঙ্গেই এসেছে। সে ঠিক পাঁচটায় অফিসে গিয়ে উপস্থিত। নুরুজ্জামান আরো দু'টা আনারস কিনেছে। দোকানদার বলে দিয়েছে — "মধুর মত মিষ্টি না হইলে আমার দুই গালে দুই চড় দিবেন।"

এদের কথা বিশ্বাস করা ঠিক না তবু সে দু'টা কিনে ফেলেছে।

তিথি বলল, আমি আনারস খাই না। বাবাও খান না। আপনি শুধু শুধু এনেছেন।

নুরুজ্জামান বিব্রতমুখে বলল, আনারস একটা ভাল ফল।

তিথি বলল, মোটেই ভাল ফল না। এর সারা গা ভর্তি চোখ। আনারসের দিকে তাকালে মনে হয় সেও হাজার হাজার চোখ মেলে আমাকে দেখছে। এই আনারস আপনাকেই খেতে হবে।

'জ্বি আচ্ছা।'

'আনারস কি করে কাটতে হয় তাও জানি না। আপনাকেই কাটতে হবে।'

'একটা বটি দিন।'

'রান্নাঘরে চলে যান। খুঁজে বের করুন। এই বাড়ির কোথায় কি আছে আমি জানি না।'

নুরুজ্জামান বটির খোঁজে রান্নাঘরে চলে গেল। তিথি চা নিয়ে গেল বাবার কাছে।

অফিস থেকে ফিরে জাফর সাহেব সাধারণত হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় বসে থাকেন। মাগরেবের আজানের পর উঠেন। তার আগে না। সারাদিন এই এক ওয়াক্তের নামাজই তিনি পড়েন। আজ তিনি শোবার ঘরে হাত-পা এলিয়ে শুয়ে আছেন। তিথিকে দেখেই বললেন, চা খাব না রে মা।

'চা খাবে না কেন? শরীর খারাপ?'

'জ্বর-জ্বর লাগছে।'

'ক্লান্ত হয়ে আছ এই জন্যে জ্বর-জ্বর লাগছে। ডিমটা খাও। বেশি করে কাঁচা মরিচ দিয়ে ওমলেট করে এনেছি। ওমলেট খেয়ে চা খাও, দেখবে ভাল লাগবে।'

জাফর সাহেব উঠে বসলেন। ডিম নিলেন না। চায়ের কাপটা নিলেন।

'তিথি!'

'জ্বি বাবা।'

'তোর মা বোধহয় আজ রাতে সিলেট যাচ্ছে বেড়াতে। তুইও যা, ঘুরে আয়। আমার এখানে অসুবিধা হবে না। হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খেয়ে নেব।'

'আমার এখানে জরুরী কাজ আছে। আমি যেতে পারব না। আমি যাই কি না যাই সেটা বড় কথা না। বড় কথা হল, তোমাদের ঝগড়াটা মিটমাট হওয়া দরকার। আমার অসহ্য লাগছে।'

জাফর সাহেব কিছু বললেন না, তিথি চেয়ার টেনে বাবার সামনে বসল। মনে হচ্ছে সে ঝগড়া করবে।

'বাবা!'

'হুঁ।'

'তুমি ভয়ংকর একটা অন্যায় করেছ। তুমি মা'র গায়ে হাত তুলেছ। আমি তো কল্পনাও করতে পারিনি যে, তুমি এমন একটা কাজ করতে পার। তুমি মা'কে চড় দাও নি?'

'হুঁ।'

'কি করে এরকম একটা কাজ করলে?'

জাফর সাহেব বিড় বিড় করে বললেন, রেগে গিয়েছিলাম। রেগে গেলে মানুষের

মাথার ঠিক থাকে না। মানুষ পশুর মত আচরণ করে।

'এত রেগেই-বা কেন গেলে?'

'সে আমাকে গালাগালি করতে করতে তোর দাদাকে গালি দেয়া শুরু করল। বলল — তুমি যেমন গাধা, তোমার বাবাও গাধা। চট করে মাথায় রক্ত উঠে গেল।'

'দাদাকে গাধা বলতেই তো আর উনি গাধা হয়ে যাননি।'

'তা যায়নি। তবু বাবাকে গালাগালিটা সহ্য হল না। আমাকে যদি কেউ গাধা বলে — তোর কি ভাল লাগবে?'

'না, ভাল লাগবে না। কিন্তু আমি তার জন্যে মারামারি শুরু করব না।'

'একেক জন মানুষ একেক রকমের মা। কারো রাগ বেশি, কারোর কম।'

'চা খাওয়া হয়েছে?'

'হুঁ।'

'এখন ডিমটা খাও।'

'ডিম খাব না।'

'খাও বলছি। আমি কষ্ট করে ভাজলাম আর তুমি খাবে না। এই দেখ, ডিম ভাজতে গিয়ে আমার হাত পুড়ে গেছে। গরম তেল ছিটকে এসে পড়ল।'

জাফর সাহেব ডিমের প্লেট হাতে নিলেন।

নুরুজ্জামান তার ঘরে গামলা ভর্তি আনারস নিয়ে বসে আছে। দোকানদার মিথ্যা বলেনি। মধুর মতই মিষ্টি। দুপুরে খাওয়া না হওয়ায় তার খিদে লেগেছে প্রচণ্ড। সে দ্রুতগতিতে আনারাস খেয়ে চলেছে। নুরুজ্জামানের মনে হল এমন মিষ্টি আনারস সে এই জীবনে খায়নি। মনে হয় বাকি জীবনেও খাবে না।

দরজায় টোকা পড়ছে। নুরুজ্জামান বলল, কে ?

তিথি বলল, আমি। আসব?

'জ্বি আসুন।'

তিথি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, গামলা ভর্তি আনারস নিয়ে বসেছেন বলে মনে হচ্ছে।

নুরুজ্জামান লজ্জিতমুখে বলল, আনারসটা খুব মিষ্টি।

'এক সঙ্গে এতটা খেতে পারবেন?'

'পারব। দুপুরে খাইনি তো। খুব খিদে লেগেছে।'

'দুপুরে খাননি কেন?'

'ঘোরাঘুরি করতে করতে সময় পার হয়ে গেল।'

'ভাত রান্না করা আছে। গরম করে দেব?'

'জ্বি না।'

'আপনাকে একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'অবশ্যই দেব।'

'একটা ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। সেখানে আমার মা আছেন। মা'কে কিছু জিনিস পৌঁছে দিতে হবে। পারবেন না?'

'এক্ষুণি দিয়ে আসছি।'

'এক্ষুণি দিতে হবে না। আপনি আপনার আনারস শেষ করুন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'চা খাবেন? চা করে দেব?'

'জ্বি–না। ফল খাবার পর পানি জাতীয় কিছু খেতে নেই। খণার বচন আছে —

"ফল খেয়ে পানি খায়
যম বলে আয় আয়।"

'যম আয় আয় বললে পানি না খাওয়াই ভাল।'

তিথি ভাত বসিয়েছে। চেয়ার এনে বসে আছে চুলার পাশে। ভাত রান্নার জন্যে ঘরে একটা রাইস কুকার আছে। তিথি সেই কুকারের ব্যবহার জানে না। জানলে এত সমস্যা হত না। তার কাছে মনে হচ্ছে এই পৃথিবীতে সবচে' জটিল কাজ হচ্ছে ভাত রান্না। ভাত কখন নরম হবে কখন শক্ত হবে কিছুই বলা যায় না। এবার মা এলে তার কাছ থেকে খুব ভাল করে কয়েকটা জিনিস শিখে নিতে হবে। ভাত রান্না এবং তরকারির রং সুন্দর করার কৌশল। তরকারি যা রান্না হচ্ছে খেতে খারাপ হচ্ছে না, কিন্তু দেখাচ্ছে কুৎসিত। মাটি–মাটি ধরনের হলুদ রঙ। টাইফয়েড রোগির পথ্য।

জাফর সাহেব রান্নাঘরে উঁকি দিলেন। মেয়েকে রান্নাঘরের চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে খুব অবাক হলেন। বিস্মিত হয়ে বললেন, হয়েছে কি তোর? এরকম চুপচাপ বসে আছিস কেন?

'ভাত রাঁধছি।'

'ভাত রাধলে চুলার পাশে এরকম গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে হয়?'

'অন্যের হয় না, আমার হয়। ভাত রান্নার সময় যে ক'টা সূরা আমার জানা আছে সব ক'টা আমি পড়ে ফেলি।'

'সূরা পড়ে ভাত রাঁধতে হবে না। চুলা বন্ধ কর।'

'রাতে আমরা খাব না?'

'চল যাই কোন একটা চাইনীজ হোটেল থেকে খেয়ে আসি।'

'আর নুরুজ্জামান সাহেব? উনি?'

'ওর জন্যে খাবার নিয়ে আসব।'

'রোজ রোজ তো আর চাইনীজ খাওয়া যাবে না।'

'একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। তুই উঠে আয়। কাপড় পর।'

তিথি উঠে এল। জাফর সাহেব বললেন, ভাল করে সাজগোজ কর্ তো। তিথি বিস্মিত হয়ে বলল, কেন?

'এম্নি। সাজলে তোকে কেমন দেখায় দেখি। দোকান যদি খোলা থাকে তোকে সুন্দর দেখে একটা শাড়ি কিনে দেব।'

তিথি বলল, দরকার নেই। তুমি কিনে দেবে, মা'র রঙ পছন্দ হবে না। সে আবার দোকানে বদলাতে নিয়ে যাবে। এটা শুনে তুমি আবার রাগ করবে। আমার শাড়ি কেনার দরকার নেই। বাইরে খেতে যাচ্ছি, চল খেয়ে আসি।

তিথি সাজগোজ করবে না বললেও ভালই সাজল। ঢাকা শহরে রাতে গয়না পরে বের হওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। তবু সে গলায় একটা হার পরল। কপালে খুব যত্ন করে টিপ আঁকল। গত জন্মদিনে কেনা নীল জামদানী শাড়িটা পড়ল। শাড়িটা তার পছন্দ না। এই প্রথম পরছে। বড় বড় শাদা ফুল। চোখে লাগে, কিন্তু পরবার পর সে নিজেই মুগ্ধ হয়ে আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে রইল। এতো সুন্দর লাগছে তাকে। আশ্চর্য তো!

জাফর সাহেব বললেন, তোর ফোন এসেছে। ফোনটা ধর্। মাই গড! তুই সাজবিনা বলেও দেখি মারাত্মক সাজ দিয়েছিস।

'সুন্দর লাগছে বাবা?'

'খুব সুন্দর লাগছে। ক্যামেরায় ফিল্ম আছে কি না দেখ্ তো। ফিল্ম থাকলে তোর একটা ছবি তুলে রাখব।'

'ছবি তুলতে হবে না বাবা। তুমি জানালা বন্ধ কর। আমরা এখন বেরুব।'

'তুই টেলিফোন ধরে আয়। মনে হচ্ছে মারুফ।'

তিথি টেলিফোন ধরতে গেল। বাবার সামনে ছুটে যেতে লজ্জা লাগছে। কিন্তু তার ইচ্ছা করছে ছুটে গিয়ে ধরতে।

'হ্যালো!'

'তিথি শোন, বেশিক্ষণ কথা বলতে পারব না। খুব জরুরী খবর আছে। কাল অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই সকাল ন'টার মধ্যে পিজা কিং-এ থাকবে। কেমন? খোদা হাফেজ।'

মারুফ টেলিফোন নামিয়ে রেখেছে। তার পরেও তিথি অনেকক্ষণ রিসিভার কানে ধরে রাখল। শব্দহীন রিসিভার কানে ধরে রাখার মধ্যেও যে আনন্দ আছে তা সে আগে বুঝতে পারে নি।

সকালে দাড়ি কামাতে গিয়ে মারুফ লক্ষ্য করল তাকে বেশ স্বাস্থ্যবান লাগছে।

ভরাট চেহারার একজন মানুষ। কয়েক রাত ভাল ঘুম হয়নি বলে চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। এই কালিটা না থাকলে তাকে আজ মোটামুটিভাবে একজন প্রেজেন্টেবল মানুষ বলা যেত।

গালে সাবান মাখতে গিয়ে হঠাৎ স্বাস্থ্য ভাল হওয়ার কারণ স্পষ্ট হল। ব্রণ উঠছে। কিছু কিছু ব্রণ আছে সুপ্ত অগ্নিগিরির মত। চামড়ার ভেতর মাথা ডুবিয়ে থাকে। মুখ বের করে না, তবে এদের কর্মকাণ্ড ভেতরে ভেতরে চলতে থাকে। তার গাল যে ফুলে-ফেপে একাকার হয়েছে এই তার রহস্য।

মারুফ ভূরু কুঁচকে আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। মুখভর্তি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। তার কিছু কিছু আবার পেকে গেছে। থুতনীর কাছের সবগুলি দাড়ি পাকা। তার বয়স বত্রিশ। বত্রিশ বছর বয়সে কারো চুল-দাড়ি এরকম করে পাকে না। তার বেলাতেই-বা এরকম হল কেন? প্রকৃতি নানান ভাবে তাকে প্রতারিত করছে। নয়ত তার মত একটি ছেলেকে চার বছর প্রাইভেট টিউশ্যানি করে চলা লাগে?

ডিসপোজেবল শেভিং রেজারটা পুরানো। সব জিনিস কিনতে মনে থাকে, রেজার কিনতে মনে থাকে না। রেজারের কথা মনে পড়ে সকাল বেলা। রহমতকে পাঠিয়ে এই মুহূর্তেই দোকান থেকে রেজার আনানো যায়। তাতে লাভ হবে না। গালে ব্লেড ছোঁয়ানো যাবে না। সুপ্ত অগ্নিগিরি জেগে উঠবে।

তিথির কাছে তাকে যেতে হবে এই অবস্থাতেই। মেরুন রঙের হাফ হাওয়াই শার্ট, সাদা পেন্ট এবং সাদা কেডস্-এর জুতা পরা যাবে না। খোঁচা-খোঁচা দাড়ির সঙ্গে এই পোশাক মানায় না। তাকে পাঞ্জাবি পরতে হবে। আধ ময়লা পাঞ্জাবি।

টেবিলে রহমত চায়ের কাপ রেখে দিয়েছে।

পিরিচ দিয়ে ঢেকে রাখার কথা রহমতের মনে নেই। কোনদিন মনে থাকবেও না। এর আগে এক লক্ষ বার বলা হয়েছে। চায়ে চুমুক দিতে গেলে অবধারিতভাবে কয়েকটা ভাসমান পিপড়া পাওয়া যাবে। সম্ভবত রহমতের ধারণা, চা বানাতে চিনি-দুধ যেমন লাগে, পিপড়াও লাগে।

'রহমত !'

'উঁ।'

'চা আরেক কাপ বানিয়ে আন। আর পাঞ্জাবি ইস্ত্রী করিয়ে আন।'

রহমত রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এল। টেবিলে রাখা চায়ের কাপ নিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে লম্বা চুমুক দিয়ে চা শেষ করল। এই কাজটা সে রান্নাঘরেও করতে পারত। তা করবে না। একে বিদেয় করে দেবার সময় হয়ে গেছে। তবে সে বিদায় করতে পারবে না। রহমত তার কর্মচারি না। এটা মিজানের ভাড়া বাসা। মিজান তিন মাসের ট্রেনিংএ রাজশাহী আছে বলে সে থাকতে পারছে। মিজান চলে এলে তাকে বিদায় নিতে হবে কারণ মিজান বিয়ে করেছে। বৌ নিয়ে থাকবে। বৌ চলে এলে বন্ধুর কথা মনে থাকে না।

'রহমত, দুপুরে আজ রান্না করবে না। দুপুরে ভাত খাব না'

রহমত উত্তর দিল না। রহমতের এই একটাই গুণ। কথাটা কম বলে। রোবট টাইপের। তবে বেকুব ধরনের রোবট। ওরা হুকুম তামিল করতে যায় কিন্তু হুকুমটা কি ঠিকমত শুনে না। ব্যাটাকে পাঞ্জাবি ইস্ত্রী করতে বলা হয়েছে। সে হয়ত পাঞ্জাবি বাদ দিয়ে পায়জামা ইস্ত্রী করিয়ে আনবে। এই সম্ভাবনা শতকরা ৬০ ভাগ।

মারুফ সিগারেট ধরিয়ে চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছে। সে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। আজ সারাদিনে তাকে প্রচুর মিথ্যা কথা বলতে হবে। সহজ মিথ্যা না, জটিল ধরনের মিথ্যা। মিথ্যাগুলি বলা হবে তিথিকে। প্রিয়জনকে মিথ্যা বলা বেশ শক্ত। মনের উপর চাপ পড়ে। অসতর্ক হলে মিথ্যার লজিক এলোমেলো হয়ে যায়। সত্য বলার সময় লজিকের দিকে খেয়াল রাখতে হয় না। মিথ্যা বলার সময় খেয়াল রাখতে হয়। মিথ্যার লজিক হচ্ছে সবচে' কঠিন লজিক। বোকা লোক এই জন্যেই মিথ্যা বলতে পারে না।

রহমত চা নিয়ে এসেছে। চায়ের কাপ নামিয়েই সে কাপড় ইস্ত্রী করতে গেল। মারুফ আড়চোখে দেখল পাঞ্জাবিটাই নিয়ে যাচ্ছে। সে খানিকটা নিশ্চিত হয়েই চায়ে চুমুক দিল। আগুন-গরম চা। মনে হচ্ছে মুখের ভেতরটা পুড়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সিগারেট বিস্বাদ লাগছে। আজ দিনটা খুব খারাপ ভাবে শুরু হয়েছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। অথচ মাথাটা খুব ঠাণ্ডা রাখা দরকার। তিথিকে সে আজ তার প্যারিসে যাবার কথা বলবে, যা পুরোপুরি মিথ্যা, অথচ এমনভাবে তা বলতে হবে যেন তিথি তা অবিশ্বাস না করে। সামান্যতম অবিশ্বাস করা মানেই অরিজিন্যাল ব্লু-প্রিন্টে গণ্ডগোল হয়ে যাওয়া। এটা কিছুতেই হতে দেয়া যাবে না।

এই মিথ্যা বলায় তার কোন পাপ হবে বলে সে মনে করে না। সে মিথ্যা বলবে সারভাইভেলের জন্যে। অনেক পোকা বেঁচে থাকার জন্যে যে গাছে বাস করে সেই গাছের রঙে নিজের রঙ বদলিয়ে নেয়। এতে পোকাটার কোন পাপ হয় না। তার হবে

কেন? তিথি যদি তার প্যারিস যাবার ব্যাপারটা বিশ্বাস করে তাহলেই পরের ধাপটা সহজ হয়ে যায়। সে বলতে পারে — শোন তিথি, প্লেনে উঠার আগে আমি বিয়ের কাজটা সেরে ফেলতে চাই। কারণ আমি চাচ্ছি প্যারিসে পৌঁছার তেরো দিনের মাথায় তুমি আমার সঙ্গে জয়েন কর।

এই মিথ্যায় কারো কোন ক্ষতি হবে না। বরং সবারই লাভ হবে। যে বিয়ে অনেকদিন ধরে ঝুলছে সেই বিয়েটা হয়ে যাবে। তিথি অসুখী হবে না কারণ সে মানুষ হিসেবে প্রথম শ্রেণীর না হলেও উপরের দিকে — দ্বিতীয় শ্রেণী। চারপাশে তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের ভীড়ে উপরের দিকে। দ্বিতীয় শ্রেণী — খারাপ কি? কৌশল ছাড়া বিয়ে সম্ভবও হবে না। যার পেশা প্রাইভেট টিউশ্যানী তাকে কে মেয়ে দেবে?

তিথি ঠিক তার জায়গায় বসে আছে। পিজা কিং-এর এক কোণায়। হাতে পানির গ্লাস। মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। মারুফের ধারণা, মেয়েরা ঘরে কখনো খবরের কাগজ পড়ে না। তারা কাগজ পড়ে ঘরের বাইরে অদ্ভুত অদ্ভুত সব জায়গায়। এবং পড়ার সময় জগৎ-সংসার ভুলে যায়। তিথি একবারও তাকাচ্ছে না। পেছন থেকে টুক করে মাথায় টোকা দিলে হয়। তিথি অবশ্যি মাথায় টোকা দিলে রেগে যায়। এই সকাল বেলাতেই রাগিয়ে দিলে মুশকিল হবে। মেয়েরা চট করে রাগ ধুয়ে ফেলতে পারে না। তারা অনেকক্ষণ রাগ পুষে। পাখি পোষার মত রাগ পুষেও তারা আনন্দ পায়।

মারুফ সামনের চেয়ারটায় বসল। তিথি খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বলল, দাড়ি রাখছ না-কি?

মেয়েদের বোধহয় দৃশ্যমান চোখ ছাড়াও কয়েক জোড়া অদৃশ্য চোখ আছে। না তাকিয়েই কি করে দেখল? মারুফ বলল, হুঁ।

'দাড়িতে তোমাকে ভাল দেখাচ্ছে। নূর সাহেবের মত লাগছে।'

'নূর সাহেবটা কে?'

'আসাদুজ্জামান নূর — অভিনয় করে।'

'ও আচ্ছা।'

তিথি খবরের কাগজ ভাঁজ করতে করতে বলল, তোমার জরুরী কথাটা কি চট করে বলে ফেল। আমাকে উঠতে হবে।

মারুফের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সে শুকনো গলায় বলল, উঠতে হলে উঠ। জরুরী কথা আরেকদিন বলা যাবে।

'রেগে গেলে না-কি?'

'না, রাগিনি।'

'মুখ গম্ভীর করে রেখেছ কেন?'

'আমার মুখটাই গম্ভীর টাইপের। খুব হাসিখুশি অবস্থাতেও আমাকে দেখলে মনে হবে কয়েকরাত ঘুম হচ্ছে না। ডিসপেপসিয়ায় ভুগছি এবং আমার পিঠে কার্বাঙ্কল হয়েছে।'

'পিঠে কি হয়েছে?'

'কার্বাঙ্কল।'

'সেটা কি?'

মারুফ কফি দিতে বলল। পিজা কিং–ওর ছেলেটাকে পাঠালো এক প্যাকেট সিগারেট আনতে। তিথি হাসিমুখে বলল, তোমার জরুরী কথাটা কি আমাকে বলে ফেল তো।

'থাক।'

'থাকবে কেন? বল।'

মারুফ হাই তুলতে তুলতে বলল, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

'এইটাই তোমার জরুরী কথা?'

'হুঁ।'

'বাইরে কোথায়? চাঁদপুর না কুমিল্লা?'

কফির কাপ দিয়ে গেছে। সিগারেট আনেনি। আগে সিগারেট না ধরিয়ে চা বা কফির কাপে চুমুক দিতে কুৎসিত লাগে। হঠাৎ মুখ মিষ্টি হয়ে যায়। মারুফ বিমর্ষ ভঙ্গিতে কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলল, ব্রিসভেন যাচ্ছি।

'সেটা কোথায়?'

'ফ্রান্সের একটা ছোট শহর।'

'বল কি! কবে?'

'আঠারো তারিখ। শেষ রাতের ফ্লাইট। তিনটা কি সাড়ে তিনটায়।'

'কোন মাসের আঠারো তারিখ? এই মাসের?'

'হ্যাঁ।'

'কি সর্বনাশ! আর তো মোটে দশ দিন আছে।'

'দশদিন না, ন' দিন। আজকের দিনটা বাদ দাও।'

তিথির নিজেকে সামলাতে সময় লাগছে। সে খানিকটা ঝুঁকে এসে বলল, তুমি তো সারাজীবন চেয়েছ আমেরিকা যেতে, এখন আমেরিকা বাদ দিয়ে ফ্রান্স?'

'কি করব — আমেরিকা যাবার সুযোগ পেলাম না —। হাতে যা পেয়েছি তাই সই। কানা মামা যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন অন্ধমামা।'

'কতদিনের জন্যে যাচ্ছ?'

'পিএইচ.ডি. করতে যতদিন লাগে — ধরে নাও চার বছর।'

মারুফের সিগারেট চলে এসেছে। সে সিগারেট ধরিয়েছে। এতগুলি মিথ্যা কথা এক নাগাড়ে বলায় কেমন ক্লান্ত লাগছে। দ্রুত কয়েকটা সিগারেট টেনে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

তিথি খুশি-খুশি এবং আনন্দিত চোখে তাকিয়ে আছে। এরকম চোখের মেয়ের কাছে মিথ্যা বলাও কষ্টের ব্যাপার। মিথ্যাটা কাঁটার মত বুকে বিঁধে থাকে। তিথি বলল, এ তো খুব আনন্দের ব্যাপার। তুমি এমন মুখ কালো করে আছ কেন?

'অনেক ঝামেলা বাকি আছে। ভিসা হয়নি। পাসপোর্ট রিনিউ করতে হবে। এর মধ্যে দেশে গিয়ে মা'কে দেখে আসতে হবে।'

'দেশে যাবে কবে?'

'আজ রাতের ট্রেনে চলে যাব। একদিন থেকে পরশু আসব। কপড়-চোপড়ও বানাতে হবে। ভাল কাপড় তো কিছুই নেই।'

'আমি দেখে-শুনে তোমার জন্যে কাপড় কিনে দেব। চল আজই চল।'

'তোমার না-কি কাজ আছে বলছিলে?'

'এমন কোন কাজ নেই।

'কাঁচা বাজার করব ভেবেছিলাম। পরে যাব। চল, গুলশান মার্কেট যাই। ওখানে সুন্দর সুন্দর শার্ট পাওয়া যায়।'

'আজ থাক। টাকা আনিনি।'

'চল পছন্দ করে আসি, পরে কিনবে।'

'চল।'

মারুফ কফির বিল দিল। দশটাকার একটা ময়লা নোট দোকানের ম্যানেজারের কাছ থেকে বদলে নিয়ে যে সিগারেট এনে দিয়েছে তাকে বখশীশ দিল।

তিথি বলল, তুমি একটু হাস তো। তোমাকে দেখে খুব খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে তোমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ছে।

'আকাশ ভেঙে পড়ার মতই। তিথি, রিকশা নেবার আগে চল খানিকক্ষণ হাঁটি। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। কথাগুলিই জরুরী। এতক্ষণ যা বললাম তা জরুরী না।'

ঢাকার রাস্তাগুলি এখন আর হেঁটে বেড়ানোর জন্যে নয় — গাদাগাদি ভিড়। পাশাপাশি গল্প করতে করতে দু'জন যাবে, তা হবে না। যেতে হবে একজনের পেছনে একজন এবং সারাক্ষণই টেনশান থাকবে এই বুঝি সামনের লোকটা হারিয়ে গেল।

যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা। তিথির পেছনে তখন থেকে এক ফুলওয়ালী হাঁটছে। 'আফা, মালা নেন না, আফা, মালা নেন না'। ফুলের মালার মত একটি উঁচু শ্রেণীর পণ্যদ্রব্য বিক্রি করলেও এদের আবার আচরণ নিম্ন শ্রেণীর। এরা জোঁকের মত লেগে

থাকে। না কিনে উপায় নেই।

তিথি মারুফকে বলল, এই, ফুলওয়ালীর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও তো। অসহ্য লাগছে। শাড়ি ধরে টানছে, গায়ে হাত দিচ্ছে।

মারুফ পেছন ফিরে ফুলওয়ালীর দিকে তাকিয়ে হাসল। কিছু বলল না। ফুলওয়ালী এতে আরো উৎসাহ পেল। যদিও তার বাড়তি উৎসাহের প্রয়োজন ছিল না।

তিথি বলল, মারুফ তুমি কি দয়া করে একটা রিকশা নেবে? এই ভিড়ে আমি হাঁটতে পারছি না।

'আর একটু। এই রোডের শেষ মাথা পর্যন্ত গিয়েই রিকশা নেব।'

'এখন নিতে অসুবিধা কি?'

'কোন অসুবিধা নেই। এরকম ভিড়ের রাস্তায় তো আর হাঁটব না। শেষ হাঁটা হেঁটে নিচ্ছি। এই দেশের ভিড়েরও যে এমন সৌন্দর্য আছে তা আগে লক্ষ্য করিনি।'

'কি সৌন্দর্য? আমি তো কোন সৌন্দর্য দেখছি না। আমি শুধু দেখছি লোকজন এসে আমার ঘাড়ে পড়ে যাচ্ছে।'

মারুফ বলল, শুধু যে লোকজন আমাদের ঘাড়ে পড়ে যাচ্ছে তা না। আমরাও লোকজনদের ঘাড়ে পড়ে যাচ্ছি এবং নির্বিকার ভঙ্গিতেই পড়ছি। এসো এখন রিকশা নেয়া যাক।

ফুলওয়ালী মেয়েটা নেই। এতক্ষণ পেছনে পেছনে এসে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল। তিথি ভেবে রেখেছিল ফুলওয়ালীকে পাঁচটা টাকা দেবে। মেয়েটা এতক্ষণ যখন লেগেছিল তখন আরেকটু কেন থাকল না?

মারুফ বলল, তুমি এইখানে দাঁড়াও আমি ওপাশ থেকে রিকশা ঠিক করে নিয়ে আসি।

'আমিও যাই তোমার সঙ্গে?'

'না না। তুমি গেলে হবে না। মেয়েছেলে সঙ্গে দেখলেই বেশি ভাড়া চাইবে।'

'অল্প কয়েকটা টাকা বাঁচাবার জন্যে এত কষ্ট করার দরকার কি?'

'অল্প কয়েকটা টাকাই-বা শুধু শুধু দেব কেন?'

মারুফ রাস্তা পার হল, সে সাবধানী চোখে রিকশা খুঁজছে। যে কোন একটা রিকশা নিলেই হয় না। রিকশাওয়ালা দেখে বিচার-বিবেচনা করে ভাড়া ঠিক করতে হয়। রিকশাওয়ালা এখানে মানুষ না, ইন্‌জিন। যে ইন্‌জিন গাড়ির বনেটের ভেতর ঢাকা থাকে না, চোখের সামনে দেখা যায়। এমন একটা ইন্‌জিন খুঁজে বের করতে হবে — যে ক্লান্ত না হয়ে দীর্ঘ সময় প্যাডেল ঘুরাবে। যার কৌতূহল প্রায় থাকবেই

না। যে পেছনে ফিরে তাকাবে না। পেছনে কি কথাবার্তা হচ্ছে তা শোনার চেষ্টা করবে না।

তিথি দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে। মারুফের রিকশা আর ঠিক হচ্ছে না। সামান্য একটা রিকশা ঠিক করতে কারোর এতক্ষণ লাগে?

রোদ কড়া হয়ে উঠেছে। আলো চোখে লাগছে। তিথি তার হ্যাণ্ডব্যাগ খুলল। আছে — সানগ্লাসটা আছে। সাধারণত দেখা যায়, যেদিন সানগ্লাসটার সবচে' বেশি দরকার সেদিনই সেটা আনা হয় না। মারুফ মনে হয় শেষ পর্যন্ত রিকশা ঠিক করতে পেরেছে। তিথি সানগ্লাস পরে অপেক্ষা করছে।

রিকশার হুড ফেলা। মারুফের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। অন্যসময় সিগারেটের ধোঁয়ার পাশে বসতে খারাপ লাগে। আজ লাগছে না। এমন কি সিগারেটের কটু গন্ধটাও ভাল লাগছে।

মারুফ বলল, তিথি শোন। খুব মন দিয়ে শোন। আমার জরুরী কথাগুলি আমি এখন বলব।

'রিকশায় বসে বলার দরকার কি? কোথাও গিয়ে বসি, তারপর বল।'

'না, রিকশাতেই শোন। জরুরী কথা চলন্ত অবস্থাতে শোনাই ভাল।'

'বল।'

'দাঁড়াও, সিগারেটটা শেষ করে নিই। তারপর বলি।'

তিথি লক্ষ্য করল, মারুফকে কেমন যেন চিন্তিত লাগছে। জরুরী কথা সে কি বলবে তা তিথি আঁচ করতে পারছে। এই কথার জন্যে তাকে চিন্তিত হতে হবে কেন?

'তিথি শোন —'

'শুনছি।'

'আমার হাতে সময় খুব অল্প। রিকশাতেও বেশি সময় তোমার সঙ্গে থাকতে পারব না, আবার দেশেও বেশি দিন নেই। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'যে স্কলারশীপ নিয়ে যাচ্ছি সেটাও গরীবি ধরনের স্কলারশীপ। টাকা জমিয়ে যে একবার দেশে আসব সে উপায়ও নেই। কাজেই দেশ ছেড়ে বাইরে থাকব প্রায় চার বছরের জন্যে। এই সময়টা আমার জন্যে অল্প সময় না। আনেকখানি সময়।'

'তা তো বটেই।'

'আমি চাই যে, যাবার আগে বিয়ে করে তারপর যাব। যাতে আমার স্ত্রী আমি যাবার তিন-চার মাসের ভেতর আমার সঙ্গে জয়েন করতে পারে।'

'আইডিয়া ভাল। সবচে' ভাল হয় সে যদি একসঙ্গে তোমার সঙ্গে যেতে পারত।'

'সেটা অবশ্যই ভাল হত কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে এই মুহূর্তে আমার কাছে একটা বাড়তি টিকেট কেনার টাকা নেই। কারণ আমার নিজের টিকেটই নিজেকে কিনতে হচ্ছে।'

'ওরা টিকেট কেনার টাকা দিচ্ছে না?'

'না। পৌঁছার পর ওরা টিকেটের টাকাটা রিইম্বার্স করবে, তার আগে না।'

'ও আচ্ছা।'

মারুফ আরেকটা সিগারেট ধারতে ধরাতে বলল, তিথি, এখন আমি আমার বক্তব্যের শেষ অংশে চলে এসেছি — মন দিয়ে শোন।

'শুনছি।'

'আমাকে বিয়ে করলে করতে হবে চার থেকে পাঁচদিন সময়ের মধ্যে। লোকজনকে খবর দিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ফরম্যাল বিয়ে করব সেটা সম্ভব না। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'বিয়ের কথা বলার জন্যে একশ' বার তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করা, তাদের বুঝানো — তাও সম্ভব না। পুরো ব্যাপারটা তোমাকেই ম্যানেজ করতে হবে। তুমি তোমার বাবা-মা, আত্নীয়স্বজন সবাইকে বলে ঠিকঠাক করে রাখবে। একজন কাজীকে খবর দিয়ে রাখবে। আমি যাব আর বিয়ে করে চলে আসব। এটা কি সম্ভব হবে?'

তিথি বলল, হবে। তুমি এত টেন্স হয়ে থেকো না তো। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে — কি ভয়াবহ সর্বনাশ হয়ে গেছে। সব ব্যবস্থা আমি করে রাখব। তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।

মারুফ বলল, আর ধর, তোমার বাবা-মা, আত্নীয়স্বজন এরা যদি রাজি না হল তাহলে আমরা কোর্টে বিয়ে করব। কি বল?

'কেউ অরাজি হবে না। আমি যা বলব তাই হবে।'

'তাহলে তো ভালই।'

তিথি বলল, ও কি? তুমি আবার সিগারেট ধরালে যে!

'টেনশান টেনশান . . . তুমি বুঝবে না।'

'কোন টেনশান না তুমি হাসি মুখে বসো তো।'

মারুফ হাসি মুখে থাকার চেষ্টা করছে পারছে না। তার আজ আজিজ সাহেবের অফিসে ঠিক এগারোটার সময় যাবার কথা। আজিজ সাহেবের দুই ছেলেকে সে পড়ায়। পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে ছোটখাট কাজ করে দিতে হয়। এতে বাড়তি কিছু আয় হয়। অন্য সবার মত আজিজ সাহেবও তাঁকে পছন্দ করেন এবং বিশ্বাস করেন। মারুফ তাঁকে বলেছে তার খোঁজে একটা ভাল নীলা পাথর আছে। দাম অনেক কিন্তু সে সস্তায় বেচে দেবে কারণ চোরাই মাল। দশ হাজার টাকা হলেই

ছেড়ে দেবে। আসল বাজারে এর দাম ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার। আজিজ সাহেব সেই পাথর দেখতে চেয়েছেন। মারুফ আজ এগারোটার সময় তাকে পাথর দেখাবে।

মজার ব্যাপার হল মারুফ পাথরের ব্যাপারে কিছুই জানে না। একজন নীলা বিক্রি করতে চায় এইটা তার তৈরি গল্প। আজিজ সাহেবের পাথরের প্রতি আগ্রহ দেখে গল্পটা বলেছিল। আগ্রহ যে এত বাড়াবাড়ি ধরনের তা বুঝতে পারে নি। বুঝতে পারলে ফট করে এই গল্প করত না। অবশ্যিই পাথরের গল্পের একটা ভাল দিক এখন দেখা যাচ্ছে। আজিজ সাহেব যদি এখন দশ হাজার টাকা দিতে রাজি থাকেন তাহলে বিয়ের খরচটা উঠে যায়।

এই মুহূর্তে মারুফ আজিজ সাহেবের ব্যাপারটা নিয়েই ভাবছে। কি ধরনের কথাবার্তা হতে পারে তার একটা রিহার্সেল সে মনে মনে করছে।

'আরে মারুফ সাহেব, আপনার এগারোটার সময় আসার কথা এখন প্রায় বারোটা বাজে। জিনিস এনেছেন?'

'না।'

'না কেন?'

'ব্যাটা এখন হাতছাড়া করতে চাচ্ছে না। টাল বাহানা করছে বলছে বেচবে না। মনে হয় অন্য কোন পার্টি পেয়েছে।'

'আপনি জিজ্ঞেস করেন নি — দিতে চাচ্ছে না কেন?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিছু বলে না।'

'মারুফ সাহেব, আপনি এক কাজ করুন পনেরো হাজার টাকা নিয়ে যান। জিনিস নিয়ে আসুন। একটা ভাল নীলার আমার অনেক দিনের শখ।'

'বাদ দিন। সামান্য একটা পাথর পনেরো হাজার টাকা। টাকা কি এত সস্তা।'

'পাথর সামান্য না। নীলা ডেনজারাস পাথর। দশ হাজারে কেন দিতে রাজি হচ্ছিল সেটাই বুঝছি না। আপনি একটা কাজ করুন। কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে যান দেখুন — কত তে আনতে পারেন।'

তিথি বলল, আচ্ছা তখন থেকে তুমি এমন চুপ করে আছ কেন? কি ভাবছ?

'কিছু না। ক'টা বাজে দেখতো।'

'দশটা।'

'আর এক ঘন্টা তোমার সঙ্গে থাকব। এগারোটার সময় আমার এক জায়গায় যেতে হবে।'

মারুফকে এখন খুব হাসি খুশি দেখাচ্ছে। সে শীষ দেবার চেষ্টা করছে। তিথি বলল, শীষ দিও না তো — একজন তরুণীকে পাশে বসিয়ে শীষ দিতে দিতে যাওয়া খুব খারাপ।

মারুফ শীষ দেয়া বন্ধ করল না।

নুরুজ্জামান সকাল ৯ টা থেকে রামপুরা টিভি ভবনের গেটে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে ঢোকার পাশ নেই। নুরুজ্জামানের গায়ে ইস্ত্রী করা পায়জামা-পাঞ্জাবি। পায়ের স্যাণ্ডেল জোড়াও নতুন। স্যাণ্ডেল কেনার তার ইচ্ছা ছিল না। ফুটপাতে সাজানো স্যাণ্ডেল দেখে কৌতূহলী হয়ে দাম করতে গেল। দাম জিজ্ঞেস করে ফিরে আসছিল, দোকানদার বলল, একটা দাম কইয়া তারপরে যান। দাম না কইয়া যান গিয়া এইটা কেমুন ধর্ম? নুরুজ্জামান অস্বাভাবিক কম দাম বলল। দোকানদার নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, লইয়া যান। এই হচ্ছে তার নতুন স্যাণ্ডেলের রহস্য।

নুরুজ্জামানের পাঞ্জাবির পকেটে পাঁচ-ছ'টা অশ্বত্থ গাছের কচি পাতা। ফজরের নামাজ শেষ করেই সে পাতার সন্ধানে গিয়েছিল। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে খানিকটা হাঁটতেই পাতা পেয়ে গেল। পাতাগুলি মিইয়ে যাচ্ছে। পাতা বেশিক্ষণ থাকে না। দু' ঘণ্টার মধ্যে মিইয়ে যায়। মিয়ানো পাতায় সুর ধরে না। ফেটে ফেটে যায়। সে বুঝতে পারছে না — আবারও কিছু টাটকা পাতা নিয়ে আসবে কি-না। কামরুদ্দিন সাহেব এখনো পাশ পাঠাচ্ছেন না কেন তাও বুঝতে পারছে না। ভুলে গেলেন নাকি? ব্যস্ত মানুষ। ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক না। উনাকে খবর পাঠাতে পারলে হত। খবর কিভাবে পাঠানো যায় তাও সে বুঝতে পারছে না।

একটার সময় টিভি ভবনের দারোয়ান বলল, কতক্ষণ আর এইভাবে ঘোরাঘুরি করবেন? যান, ভিতরে চলে যান।

'পাশ নাই তো।'

'পাশ লাগবে না।'

'অশেষ শোকরিয়া।'

নুরুজ্জামান কামরুদ্দিনের ঘর খুঁজে বের করল। ঘর তালাবন্ধ। জানা গেল, তিনি ইউনিট নিয়ে আউটডোর শুটিং-এ গেছেন। শুটিং হচ্ছে সাভারে — বড়খালি নামের এক গ্রামে। সন্ধ্যা পর্যন্ত শ্যুটিং হবে। নুরুজ্জামান বড়খালি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সন্ধ্যা-সন্ধ্যায় পৌঁছতে পারলেই হল। সমস্যাটা হল — বড়খালি জায়গাটা

কোথায় কেউ বলতে পারছে না। সাভার চলে গেলে একটা খোঁজ নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। উপস্থিত হতে পারলে দু'টা লাভ হবে — কামরুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে। টিভির শ্যুটিং কিভাবে করে তাও দেখা হবে। ব্যাপারটা তার দেখার শখ।

সন্ধ্যার আগে-আগে নুরুজ্জামান বড়খালি গ্রামে উপস্থিত হল। শ্যুটিং ততক্ষণে শেষ হয়েছে। কামরুদ্দিন প্যাক আপ করে দিয়েছেন। ক্যামেরা গাড়িতে উঠছে। নুরুজ্জামান কামরুদ্দিনের কাছে গিয়ে হাসিমুখে বলল, স্লামালিকুম স্যার।

কামরুদ্দিন অন্ধকার মুখে বলল, কে?

'স্যার আমি নুরুজ্জামান। আপনি টিভিতে যেতে বলেছিলেন, গিয়েছিলাম, শুনলাম এখানে আছেন। চলে এসেছি।'

'তাই তো দেখছি।'

'শ্যুটিং কি শেষ হয়ে গেছে স্যার?'

'হ্যাঁ'

'জিনিসটা দেখার শখ ছিল।'

কামরুদ্দিন শুকনো মুখে বলল, বেশি বেশি শখ ভাল না। শখ কম থকা ভাল।

'জ্বি, তা ঠিক। স্যার, আমি তাহলে কবে দেখা করব?'

'কি জন্যে? কি ব্যাপারে?'

নুরুজ্জামান বিস্মিত হয়ে বলল, ঐ যে স্যার পাতার বাঁশি।

'কিসের পাতার বাঁশি?'

'স্যার আপনার মনে নেই। ঐ যে আপনি গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলেন, আপনাকে পাতার বাঁশি শুনালাম। আপনি বললেন ঢাকায় এলে দেখা করতে।'

'ও আচ্ছা। এই বারে কিছু হবে না। আগামী প্রান্তিক পর্যন্ত সব বুক হয়ে আছে। ছয় মাস পরে আসুন, দেখি কি করা যায়।'

'আষাঢ় মাসে আসব?'

'আসুন।'

টিভির বিরাট বাস এসেছে। বাস খালি পড়ে আছে। কামরুদ্দিন সাহেব ইচ্ছা করলেই নুরুজ্জামানকে সঙ্গে নিয়ে নিতে পারতেন। তা নিলেন না। নুরুজ্জামান হাঁটা ধরল। তাকে হাঁটতে হচ্ছে খালি পায়ে। নতুন স্যাণ্ডেলের ফিতা এর মধ্যেই খুলে গেছে। এখনো চব্বিশ ঘন্টা পার হয়নি, এর মধ্যেই এই অবস্থা। অথচ কেনার সময় দোকানদার বলল, 'লাইফ গ্যারান্টি'। এরা অশিক্ষিত মূর্খ। 'লাইফ গ্যারান্টি' শব্দটির মানেই বোধহয় জানে না। জানলে বলত না। অশিক্ষিত লোকজন সাধারণত সৎ হয়।

জাফর সাহেব আজ সকাল সকাল বাসায় ফিরেছেন। এসে দেখেন তিথি নেই। শূন্য বাড়িতে ঢুকতে ভাল লাগে না। শূন্য বাড়িতে ঢুকলে মনে হয়, বাড়িটা চোখ বড় বড় করে দেখছে। তিনি শুনেছেন, বেশির ভাগ মানুষ পাগল হয় যখন সে একা একা থাকে। একজন কেউ সঙ্গি পাশে থাকলে না-কি কেউ পাগল হতে পারে না।

জাফর সাহেবের গা ছম ছম করতে লাগল। তিনি বাথরুমে ঢুকলেন কিন্তু বাথরুমের দরজা লাগালেন না। তাঁর কেবলি মনে হল — বাথরুমের দরজা লাগালেই আর খুলতে পারবেন না। খুলতে গেলেই দেখা যাবে বাইরে থেকে কেউ দরজা চেপে ধরে আছে।

তিনি রান্নাঘরে গিয়ে গরম পানি বসালেন। এককাপ চা খাওয়া দরকার। টি-ব্যাগ চা, চিনি এসব নিশ্চয়ই হাতের কাছেই পাওয়া যাবে। তিথি হরদম বানাচ্ছে। রাতে ঘুমুতে যাবার আগেও তার চা খেতে হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার, চা, দুধ, চিনি কিছুই নেই। একটা পাওয়া না গেলে অন্যটা তো পাওয়া যাবে। চা পাওয়া না গেলে দুধ। দুধ পাওয়া না গেলে চিনি। কিছুই নেই।

তাঁর মাথায় রক্ত চড়ে গেল। জিনিসগুলি ঘরেই আছে অথচ তিনি পাচ্ছেন না, তা কেমন করে হয়! এমন তো না যে জিনিসগুলি অদৃশ্য হয়ে আছে বলে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। ঘরেই কোথাও আছে। যাবে কোথায়? থাকতেই হবে।

সন্ধ্যাবেলা তিথি বাসায় ফিরে দেখে রান্নাঘরের সমস্ত জিনিস মেঝেতে নামানো। ফ্রীজের পানির বোতল নামাতে গিয়ে দু'টা পানির বোতল ভেঙেছে। থৈ-থৈ করছে পানি। ভাঙা কাঁচে জাফর সাহবের পা কেটেছে।

তিথি হতভম্ব হয়ে বলল, কি হয়েছে বাবা?

জাফর সাহেব অপ্রস্তুত গলায় বললেন, চায়ের দুধ, চিনি, চা এইসব কোথায় রেখেছিস? খুঁজে পাচ্ছি না।

'গ্যাসের চুলার পেছনেই তো সব রাখা। এই তো।'

'ও আচ্ছা।'

'বাবা, তুমি তো দেখি সব একাকার করে ফেলেছ?'

'হুঁ।'

'চা খাবে? তুমি বারান্দায় বোস, আমি চা বানিয়ে আনছি।'

'না, এখন আর ইচ্ছা করছে না। বাদ দে।'

'তোমার কি শরীর খারাপ করেছে না-কি? দেখি কাছে আসো তো, গায়ে হাত দিয়ে দেখি। না, শরীর তো ঠাণ্ডা।'

জাফর সাহেব হাসতে চেষ্টা করলেন। হাসি স্পষ্ট হল না। তিথি বলল, তোমার জন্য স্যাণ্ডউইচ কিনে এনেছি। নাও, স্যাণ্ডউইচ নাও। বাবা, এখন থেকে এই

ব্যবস্থা। আমি বাজার থেকে স্যাণ্ডউইচ কিনে ঘরে রেখে দেব। খিদে লাগলে খাবে।

'আচ্ছা।'

জাফর সাহেব স্যাণ্ডউইচ খেয়ে অবেলায় বিছানায় গিয়ে শুলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন। গাঢ় গভীর ঘুম। তিথি রাত দশটায় অনেক কষ্টে তাঁকে ডেকে তুলল। তিনি জানালেন রাতে কিছু খাবেন না। জ্বর-জ্বর লাগছে।

নুরুজ্জামানও রাতে কিছু খেল না। সে আজও দু'টা আনারস কিনে নিয়ে এসেছে। রাতে ভাতের বদলে আনারস খেয়েছে। তিথি ভেবে পাচ্ছে না লোকটা পাগল কি-না।

নুরুজ্জামানের আজ অবশ্যি আনারস কেনার কোন ইচ্ছা ছিল না। সে গিয়েছিল আনারসওয়ালাকে ধন্যবাদ দিতে। "ঐদিনের আনারস অসম্ভব মিষ্টি ছিল, খেয়ে তৃপ্তি পেয়েছি" — এই কথাগুলি শুধু বলে আসা, লাভের মধ্যে লাভ এই হয়েছে আনারসওয়ালা আরো দু'টা ধরিয়ে দিয়েছে।

'টেকা না থাকলে পরে আইস্যা দাম দিয়েন। অসুবিধা কিছু নাই। আর দাম না দিলেও ক্ষতি নাই। দুইটা আনারসের জন্য আমি না খাইয়া মরুম না।'

এই কথার পর না কিনে উপায় থাকে না।

তিথি একা একা খেতে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নুরুজ্জামান এসে সামনে বসল। অপরিচিত একজন পুরুষ মানুষের সামনে বসে খাওয়া অস্বস্তিকর। তাকে উঠে চলে যেতে বলা আরো অস্বস্তিকর।

নুরুজ্জামান বলল, স্যার খাবেন না?

'না, বাবার শরীরটা ভাল না।'

'কি হয়েছে?'

'তেমন কিছু না। গা গরম। আপনি রাতে যদি কিছু না খান তাহলে শুধু জেগে আছেন কেন? শুয়ে পড়ুন।'

'আপনি একা একা খাবেন এই জন্যে বসে আছি।'

'আমার জন্যে বসে থাকতে হবে না। আমার একা খেতেই ভাল লাগে।'

স্পষ্ট ইংগীত। এরচে স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় আপনি দয়া করে উঠে যান তো। আমার সামনে ড্যাব ড্যাব চোখে বসে থাকবেন না। নুরুজ্জামান বসেই আছে। লবনদানী থেকে খানিকটা লবন হাতে নিয়ে আংগুলে করে খাচ্ছে। লবন কি একটা খাবার জিনিস?

নুরুজ্জামান বলল, রাতে ভাত না খাওয়াটা ঠিক না। এতে শরীর থেকে একটা চড়ুই পাখির রক্ত চলে যায়।

'তাই না-কি?'

'গ্রামের কথা। মা চাচীর মুখে শুনেছি।'

'আপনি যা শুনেন তাই বিশ্বাস করেন?'

'জ্বি। বিশ্বাস করাই ভাল। শুধু শুধু অবিশ্বাস করব কেন?'

আমি যদি বলি, কাল রাতে একটা ভূত এসে আমার খাটের নিচে শুয়েছিল তাহলে বিশ্বাস করবেন?

'আপনি বললে অবশ্যই করব। আপনি শুধু শুধু আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবেন কেন?'

কথার পিঠে কথা বলে যেতে তিথির ভাল লাগছে না। তাছাড়া তাকে আজ অনেক কথা বাবাকে গুছিয়ে বলতে হবে। মারুফের সঙ্গে তার সম্পর্ক, মারুফের বাইরে যাবার ব্যাপার। অল্প ক'দিনের জন্যে যে বিয়ের পর্ব শেষ করতে হবে সেটা। তাছাড়া মা'র সঙ্গেও কথা বলতে হবে। ছোট মামার টেলিফোন নাম্বার আছে। এরিয়া কোড জানা নেই। কোথাও নিশ্চয়ই লেখা আছে।

নুরুজ্জামান হাসি মুখে বলল, পাতা জোগার হয়েছে।

'কি জোগার হয়েছে?'

'পাতা। অশ্বথের পাতা।'

'অশ্বথের পাতা দিয়ে কি করবেন?'

'পাতার বাঁশি বাজাব।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা। ভুলে গিয়েছিলাম।'

'আপনি শুনতে চাইলে খাওয়ার পর খানিকক্ষণ . . . '

'আরেকদিন শুনব। আজ আমার বাঁশি শুনতে ইচ্ছা করছে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আপনি শুয়ে পড়ুন।'

'আপনার খাওয়া শেষ হলেই শুয়ে পড়ব।'

'ঢাকার কাজ কর্ম শেষ হয়েছে?'

'জ্বি না। মন্ত্রী সাহেবের সঙ্গে এখনো দেখা করতে পারিনি।'

'চেষ্টা করছেন?'

'জ্বি। উনার পিএ আমাকে টেলিফোন করে সময় দেবেন। মন্ত্রীরা খুব ব্যস্ত থাকেন। বললেই সময় দিতে পারেন না। আমি আপনাদের টেলিফোন নাম্বার দিয়ে এসেছি।'

তিথি বলল, আমাদের টেলিফোন নাম্বার লোকজনদের দিয়ে বেড়াবেন না। টেলিফোন নাম্বার হল খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার।

'আমি শুধু উনাকেই দিয়েছি। আর কাউকে না।'

তিথি খাওয়া শেষ না করেই উঠে পড়ল। খেতে ভাল লাগছে না। সে এখন নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকবে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাববে বাবাকে পুরো ব্যাপারটা কি ভাবে বলা যায়। যখন সমস্ত কথাবার্তা গোছানো শেষ হবে তখন সে বাবার ঘরে যাবে। তিনি জেগে থাকলে তাকে তখনি বলবে। জেগে না থাকলে ভোরবেলা বলবে। সে নিজে ঘুমুবে না। সারারাত ভাববে। দরকার হলে পুরো ব্যাপারটা কাগজে গুছিয়ে লিখবে। ভোরবেলা নিজের মুখে কিছু না বলে কাগজটা ধরিয়ে দেবে। নরম গলায় বলবে — এখানে কিছু জরুরি কথা লেখা আছে। তুমি এখন পড়বে না। অফিসে নিয়ে যাও। অফিসে গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় পড়বে। তারপর যদি আমাকে কিছু বলতে চাও — বাসায় টেলিফোন করবে আমি বাসাতেই থাকব।

তিথি নিজের ঘরে ঢুকল। ঘরে বাতি জ্বলছিল বাতি নিভিয়ে দিল। প্রচুর কাজ পড়ে আছে রান্নাঘর কিছুই গোছানো হয় নি। ঐ ঘরে এখন ঢুকতেই ইচ্ছা করছে না।

তিথি বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। এত ক্লান্তি লাগছে মাথার নিচে বালিশটা পর্যন্ত টেনে দিতে ইচ্ছে করছে না। তিথি চোখ বন্ধ করল আর তখনি জাফর সাহেবের গলা শোনা গেল। ভয় পাওয়া গলায় তিনি ডাকছেন — 'ও তিথি তিথি।' এরকম অদ্ভুত ভঙ্গিতে বাবা তাকে ডাকছেন কেন? তিথি প্রায় ছুটে গেল।

জাফর সাহেবের ঘরে বাতি জ্বলছে। তিনি খাটের মাঝখানে উবু হয়ে বসে আছেন। তাঁর ঘুম ভেঙ্গেছে ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের ঘোর এখনো রয়ে গেছে। তাঁর বুক ধ্বক ধ্বক করছে।

'বাবা কি হয়েছে?'

'কিছু না। পানি খাব। পানি দে।'

তিথি পানি এনে দিল। জাফর সাহেব এক চুমুকে পানি শেষ করে গ্লাস মেয়েকে ফেরত দিতে দিতে বললেন, এক কাজ করলে কেমন হয়রে তিথি।

'কি কাজ?'

'চল — কাল দু'জনে সিলেট চলে যাই। তোরতো অনেক দিনের ইচ্ছা ছোটমামার চা বাগান দেখবি। বাগান দেখা হল।'

'চল যাই।'

'সকালে ট্রেন আছে। ঐ ট্রেনে যাওয়া যাবে না। অফিস থেকে ছুটি নিতে হবে। রাতের ট্রেনে যাই চল।'

'আমি রাজি। কাল সব গুছিয়ে রাখব।'

'ঐ গাধাটাকে কি করবি?'

'কোন গাধা?'

'নুরুজ্জামান।'

'ও আচ্ছা। উনাকে বাসা পাহারা দেবার দায়িত্বে রেখে যাব।'

'সেটা মন্দ না।'

'তোমার কি শরীর খারাপ ভাবটা একটু কমেছে?'

'হুঁ।'

'ভাত খাবে এনে দেই? আজকের তরকারী তত খারাপ হয় নি। মুখে দিতে পারবে।'

'ভাত খাব নারে মা। ভাত ছাড়া অন্য কিছু থাকলে এনে দে।'

'স্যাণ্ডউইচ আছে। দেব?'

'দে।'

'সঙ্গে এক গ্লাস দুধ দেব?'

'আচ্ছা দে।'

জাফর সাহেব বেশ আরাম করেই স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছেন। তিথি সামনে বসে আছে। তিথির খুব মায়া লাগছে। তিথি নরম গলায় ডাকল, বাবা!

'কি রে মা।'

তিথি খানিকটা অস্বস্থি খানিকটা লজ্জা মেশানো গলায় বললো, বাবা শোন! আমি যদি নিজের পছন্দের একটা ছেলেকে বিয়ে করতে চাই তাহলে তুমি কি খুব রাগ করবে?

জাফর সাহেব খাওয়া বন্ধ করে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তিথি হঠাৎ অসম্ভব লজ্জা পেয়ে গেল। সে জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি এমন করে তাকিয়ে আছ কেন?

জাফর সাহেব বললেন, তোর পছন্দের কোন ছেলে আছে?

'হুঁ।'

'আশ্চর্য কাণ্ড! তুইতো সেদিনের বাচ্চা মেয়ে।'

'বাবা আমি সেদিনের বাচ্চা মেয়ে না। আমি **M.Sc** পরীক্ষা দিয়ে বসে আছি। আমার বয়স এখন ২৪ বৎসর তিন মাস।'

জাফর সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, বলিস কি তোর চব্বিশ হয়ে গেছে?

'হয়েছে।'

'ছেলেটা কি করে?'

'এতদিন কিছু করত না। খবরের কাগজে ফ্রী ল্যান্স লেখা লিখত দু' তিনটা প্রাইভেট টিউশ্যুনি করে। এখন অবশ্যি **ph.D** করতে ফ্রান্সে যাচ্ছে। তার ইচ্ছা ছিল আমেরিকা যাবার।'

'ছেলের বাবা কি করেন?'

'ছেলের বাবা কি করেন আমি জানি না। কখনো জিজ্ঞেস করি নি। ছেলের বাবা কি করেন সেটা কি খুব জরুরি?'

জাফর সাহেব চুপ করে রইলেন। তিথি বাবার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বলল, একটা মেয়ের যখন একটা ছেলেকে ভাললাগে তখন ছেলের বাবা মেয়েটির সামনে থাকে না।

'প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে। ছেলের বাবার ছায়া থাকে ছেলের মধ্যে। আমার খানিকটা ছায়া কি তোর মধ্যে নেই?'

'জানি না, আছে হয়ত। আচ্ছা বাবা ধর ছেলের বাবা খুবই সামান্য একজন মানুষ। কোন অফিসের পিওন, কিংবা ধর রিকশাওয়ালা। এই অবস্থায় তুমি কি করবে? তুমি কি বলে দেবে — না বিয়ে হবে না।'

জাফর সাহেব বললেন, ছেলেটিকে তোর কি খুব পছন্দ?

'হ্যাঁ।'

'আমি দেখেছি তাকে?'

'একদিন দেখেছ। তবে তোমার নিশ্চয়ই মনে নেই।'

'ওর কোন ছবি আছে তোর কাছে? নিয়ে আয়তো।'

তিথি লজ্জিত গলায় বলল, তুমি ভেবেছ কি আমাকে? আমি বুঝি ওর ছবি বালিশের নিচে রেখে ঘুমাই? ছবি টবি নেই। তিথি এইখানে খানিকটা মিথ্যা বলল। মারুফের ছবি তার কাছে আছে। একটা না বেশ কয়েকটা ছবি।

'দেখতে কেমন?'

'মোটামুটি। তবে এ্যাপোলো না।'

'বুদ্ধিমান?'

'অবশ্যই বুদ্ধিমান।'

'ওর নাম কি?'

'মারুফ।'

জাফর সাহেব খুশি খুশি গলায় বললেন, নামটাতো ভাল — মা দিয়ে শুরু। যে সব ছেলের নাম মা দিয়ে শুরু হয় তাদের হৃদয় নরম থাকে। আমাদের সঙ্গে একটা ছেলে ছিল — মাহফুজ নাম, খুব ভাল ছেলে।

'তোমার অদ্ভুত ধরণের কথাবার্তা বন্ধ করতো বাবা। মা দিয়ে নাম শুরু হলে ছেলে হবে হৃদয়বান। দুধটা খেয়ে শেষ কর — গ্লাস হাতে নিয়ে বসে আছ কেন?'

জাফর সাহেব এক চুমুকে দুধ শেষ করলেন। তাঁকে এখন খুব আনন্দিত বলে মনে হচ্ছে। তিথি বলল, তুমি কিন্তু এখনো আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নি।

'তুই আবার কি প্রশ্ন করেছিস?'

'এই যে বললাম — আমি যদি আমার পছন্দের একটা ছেলেকে বিয়ে করি তুমি রাগ করবে কি–না।'

'রাগ করব কেন?'

'বিয়েটা যে খুব তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার সেটা কি বুঝতে পারছ?'

'না — তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার কেন?'

'ও বিয়ে করে তারপর যেতে চায়। যাতে ও চলে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই আমি ওর কাছে চলে যেতে পারি। এখন বুঝতে পারছ?'

'পারছি। ভালই হল কাল সিলেট গিয়ে তোর মা'কে নিয়ে আসি। ও ব্যবস্থা ট্যাবস্থা করুক। ছেলের আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গেও আমার কথা বলা দরকার। মামুনকে বললে ও কি তার বাবাকে নিয়ে আসতে পারবে না?'

'মামুন না বাবা মারুফ!'

'ও সরি। মারুফ। ওকে বল ও যেন ইমিডিয়েটলি ওর বাবাকে খবর দিয়ে নিয়ে আসে।'

'ওকে বলতে পারব না বাবা। ও এখন দেশের বাড়িতে গেছে আত্মীয় স্বজন সবার কাছ থেকে বিদায় নিবে।'

'আসবে কবে?'

'তাওতো বলতে পারছি না। দু' তিন দিন নিশ্চয়ই লাগবে।'

জাফর সাহেব উৎসাহের সঙ্গে বললেন — নো প্রবলেম তুই চিঠি লিখে দে। নুরুজ্জামান গাধাটা চিঠি নিয়ে ওর বাড়িতে চলে যাক। ওতো বসেই আছে।

'ওর বাড়ির ঠিকানা জানি না বাবা।'

'তাহলেতো প্রবলেম হয়ে গেল।'

'কোন প্রবলেম নেই। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাও।'

'কাল কি আমরা সিলেট যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ যাচ্ছি।'

'সকালের ট্রেনে চলে যেতে পারলে হত। তোর মা'র সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে আলাপ করা দরকার। এখন কি টেলিফোনে কথা বলব?'

'এখন টেলিফোনে কথা বলার দরকার নেই। অনেক রাত হয়ে গেছে। এত রাতে টেলিফোন করলে মা রাগ করবে। তাছাড়া আমরা হঠাৎ উপস্থিত হয়ে মা'কে তো সারপ্রাইজ দেবই। আগে ভাগে কথা বলে সেই সারপ্রাইজ নষ্ট করা ঠিক না। বাবা তুমি শুয়ে পড়।'

জাফর সাহেব শুয়ে পড়লেন। তিথি রান্নাঘরে ঢুকে চা বানাল। তার ক্লান্তি হঠাৎ করে কেটে গেছে। এখন কিছুক্ষণ বারান্দায় বসে থেকে চা খাওয়া যায়। আজ

আকাশে চাঁদের অবস্থাটা কি কে জানে?

চা-টা চমৎকার হয়েছে। কাপ শেষ হবার পর মনে হল — বিরাট মগভর্তি এক মগ চা বানালে ভাল হত। অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া যেত। টেলিফোন বাজছে। এত রাতে কে টেলিফোন করবে? আজে বাজে কল না তো? ইদানিং গভীর রাতে দুষ্ট প্রকৃতির কিছু লোকজন টেলিফোন করে বিরক্ত করে।

তিথি ভয়ে ভয়ে বললো, হ্যালো।

ও পাশ থেকে মারুফ বলল, তিথি জেগে আছ?

'সেকি তুমি দেশে যাও নি?'

'না।'

'কেন?'

'যাবার জন্যে ব্যাগ গুছিয়ে ঘর থেকে বের হয়েই দেখি — পিতাজী। রিকশা থেকে নামছেন?'

'কে নামছেন।'

'আমার বাবা।'

'ও আচ্ছা। উনি কি এখন ঢাকায়?'

'হ্যাঁ ঢাকায়।'

'কোথায়? তোমার এখানে?'

'হ্যাঁ আমার এখানেই।'

'ক' দিন থাকবেন বলতো?'

'কয়েকদিন নিশ্চয়ই থাকবেন। কেন বলতো?'

তিথি আনন্দিত ভঙ্গিতে বলল, আমি বাবাকে সব কথা বললাম। বাবা উনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন। ভালই হয়েছে উনি এখন ঢাকায়। তুমি কি কাল ভোরে তাঁকে আমাদের এখানে নিয়ে আসবে? আমরা এক সঙ্গে সকালে নাশতা খাব।

মারুফ চিন্তায় পড়ে গেল। বাবাকে নিয়ে হঠাৎ এই সমস্যা হবে সে বুঝতে পারে নি। একটা মিথ্যা ঢাকতে এখন পরপর অনেকগুলি মিথ্যা বলতে হবে। প্রতিটি মিথ্যাই খুব গুছিয়ে বলতে হবে। যেন যুক্তিতে কোন খুঁত না থাকে।

'হ্যালো কথা বলছ না কেন? নিয়ে আসতে পারবে সকালে?'

'পারারতো কথা। তবে আমি নিশ্চিত না।'

'নিশ্চিত না কেন?'

'বাবা এসেই অকারণে আমার সঙ্গে ঝগড়া করলেন। নিতান্ত ফালতু বিষয় নিয়ে হৈ চৈ। রাগারাগি। আমি নাকি ছ'মাস ধরে তাঁর চিঠির কোন জবাব দিচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে তাঁকে চলে আসতে হয়েছে।'

'চিন্তিত হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। তুমি ছ' মাস চিঠি দেবে না আর উনি চিন্তিত হতে পারবেন না?'

'অবশ্যই চিন্তিত হতে পারবেন তবে তার মানে এই না যে তিনি রিকশাওয়ালার সামনে আমাকে গাধা বলবেন।'

তিথি হাসতে হাসতে বলল, উনার স্বভাবও দেখি আমার বাবার মত। আমার বাবাও রেগে গেলে এমন গালাগালি করেন। তবে তাঁর রাগ অবশ্যি বেশিক্ষণ থাকে না। বাবার রাগ ভাদ্র মাসের বৃষ্টির মত ক্ষণ স্থায়ী।

'আমার বাবারটা স্থায়ী। আমার উপর রাগ করেই রাতে ভাতটাত না খেয়ে ঘুমুতে গেছেন। ঘুম আসছে না। পেটে প্রচণ্ড ক্ষিধে ঘুম আসার কথা না। এপাশ ওপাশ করছেন। তিনি তাঁর ব্যাগ গুছিয়ে মাথার কাছে রেখে দিয়েছেন। এটা হচ্ছে বিশেষ এক লক্ষণ — বাবা ফজরের নামাজ পড়েই বাসা ছেড়ে চলে যাবেন।'

'বল কি?'

'আমি প্রাণপন চেষ্টা করব উনাকে আটকে রাখতে। যদি পারি তাহলে অবশ্যই সকাল আটটার মধ্যে তোমাদের বাসায় এনে উপস্থিত করব। যদি না পারি তাহলে আমি নিজেই আসব। তাতে কাজ হবে?'

'হ্যাঁ হবে।'

'তোমাকে যে জন্যে টেলিফোন করেছিলাম সেটাইতো বলা হয় নি।'

'কি জন্যে টেলিফোন করেছ?'

'চার লাইনের কবিতা শুনাতে চেয়েছিলাম —

'শোনাও।'

'থাক এখন না। কাল সকালে যখন আসব তখন শোনাব।'

'না এক্ষুণী শুনাও।'

'নিঝুম রাতের জ্যোৎস্না এসে স্মৃতির ভাঁড়ার লোটে
ফাগুন হাওয়ায় সিদকাঠিটা বুকের মধ্যে ফোটে
হৃদয় ফেটে কাব্য ঝরে ব্যথার শোনিত পারা
রূপকথা নয়, রূপকথা নয়, এই জীবনের ধারা।'

জাফর সাহেব আটটার আগেই অফিসে চলে যান। আজ সাড়ে ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। ছেলের বাবা আসবে তাঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার। কি কি বলবেন তাও গুছিয়ে রেখেছেন। তিনি বলবেন, ছেলে চলে যাবে মেয়ে একা থাকবে এটা তাঁর পছন্দ না। দু'জন এক সঙ্গেই যাক। টিকিটের টাকা তিনি দেবেন। এটা কোন ব্যাপার না।

তাঁর ক্ষিধে লেগেছে। এখনো নাশতা করেন নি। মেহমানদের সঙ্গে নিয়ে নাশতা করবেন এই ভেবে রেখেছেন।

তিথি বলল, তুমি খেয়ে নাও বাবা। তারা বোধহয় আসবেন না।

'আসবে না কেন?'

'বাবা আর ছেলের মধ্যে রাগারাগি হয়েছে। মনে হয় বাবার রাগ ভাঙ্গানো যাচ্ছে না। তুমি খেয়ে নাও।'

'ওরা যদি এসে দেখে আমরা নাশতা টাশতা খেয়ে বসে আছি সেটা কি একটা নিতান্তই অনুচিত কাজ হবে না?'

'আমি না হয় অপেক্ষা করি।'

'আচ্ছা দে দেখি। নাশতা করেই ফেলি।'

জাফর সাহেব লক্ষ্য করলেন তাঁর মেয়ে অনেক খাবারের আয়োজন করেছে। পরোটা, ভূনা গোশত, পাউরুটি, মাখন, ডিম, একটা বাটিতে চিড়া ভাজা, অন্য একটা বাটিতে মুড়ি। জাফর সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, পরোটা তুই ভেজেছিস না-কি? ভাল হয়েছে। খুব ভাল হয়েছে।

তিথি লজ্জিত গলায় বলল, পরোটা আমি ভাজি নি বাবা। পাশের ফ্ল্যাটের অরুনার মা, উনাকে বলেছিলাম। উনি বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

'গোশতও উনি রান্না করেছেন?'

'গোশত আমি রান্না করেছি। ভাল হয়নি বাবা?'

'ভাল হয়েছে। খুব ভাল হয়েছে অনেক পদ করেছিস। ঠিকমত নাশতা করলে দুপুরে আজ আর খেতে হবে না।'

তিথির লজ্জা লাগছে। এতগুলি পদ টেবিলে সাজানো বাবা নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছেন। তাছাড়া সে খানিকটা সাজগোজও করেছে। বাবার চোখে পড়ার কথা। তেমন আহামরি কিছু না — চোখে কাজল দিয়েছে। নতুন ভাজ ভাঙ্গা একটা শাড়ি পরেছে।

'তিথি!'

'জ্বি বাবা।'

'তোর কি পাসপোর্ট আছে?'

'না।'

'পাসপোর্ট সাইজ ছবি আছে?'

'না।'

'তাহলে তুই এক কাজ কর। নিউমার্কেটে গিয়ে পাসপোর্টের জন্যে ছবি তোল। এরা ঘন্টা খানিকের মধ্যে ছবি দিয়ে দেয়। ঐ ছবি নিয়ে তুই দুপুর বারটার মধ্যে আমার অফিসে চলে আসবি। তারপর তোকে নিয়ে আমি পাসপোর্ট অফিসে যাব। দু' দিনের মধ্যে পাসপোর্ট বের করতে হবে!'

তিথি অস্পষ্ট গলায় বলল, কেন?

'আমি চাই তোরা দু'জন যেন এক সঙ্গে যেতে পারিস। সেটাই ভাল হবে। তোর কোন আপত্তি আছে?'

তিথি লজ্জিত গলায় বলল, না।

'গুড। আপত্তি থাকাটা কোন কাজের কথা না। আজ সিলেটে যাচ্ছি মনে আছে তো?'

'মনে আছে।'

'জিনিস পত্র গুছিয়ে নে। তোর মা'কে ধরে বেঁধে নিয়ে আসতে হবে। কাল সকালে পৌঁছব বিকেলের ট্রেনে সবাইকে নিয়ে ঢাকা চলে আসব।'

'মা আসতে রাজি হবেতো?'

'অবশ্যই রাজি হবে। মেয়ের বিয়ে মা আসবে না। কি বলিস তুই। ঝগড়া আপাতত মুলতুবী থাক। বিয়ে টিয়ে হয়ে যাক তারপর আবার নতুন উদ্যমে শুরু করা যাবে।

জাফর সাহেব চলে গেছেন। তিথি অপেক্ষা করছে। মারুফের আসার নাম নেই। আসতে না পারলে একটা টেলিফোন তো করবে। তাও করছে না। তিথির

খিধে লেগেছে কিন্তু কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না। এতক্ষণ পর্যন্ত না খেয়ে বসে থাকার জন্যেই বোধহয় মাথা ধরেছে। হালকা ধরণের মাথা ব্যথা যা এক সময় সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

তিথি খালি পেটে চা খেল। সকাল থেকে এই পর্যন্ত চার কাপ চা খাওয়া হয়েছে। সে ঠিক করে ফেলল মারুফ না আসা পর্যন্ত সে কিছুই খাবে না। সে যদি আজ রাত এগারোটায় আসে তিথি রাত এগারোটা পর্যন্ত না খেয়ে অপেক্ষা করবে।

মারুফের সবচে বড় সমস্যা হল সে বেশীর ভাগ সময়ই কথা দিয়ে কথা রাখে না। তার জন্যে সে মন খারাপ করে না বা দুঃখিতও হয় না। যেন কথা দিয়ে কথা না রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার না। স্বাভাবিক ব্যাপার।

তিথি ঘড়ি দেখে ঠিক এগারোটা বাজার দশমিনিট আগে ঘর তালা দিয়ে বের হল। নিউমার্কেট যেতে লাগবে দশ মিনিট। ছবি তুলে এক ঘন্টা ঘোরাফেরা করবে। বারোটায় ছবি ডেলিভারী নিয়ে বেবীটেক্সী করে বাবার কাছে চলে যাবে। সেখান থেকে পাসপোর্ট অফিস।

জাফর সাহেব অফিসে এসে দেখেন তাঁর ঘর খোলা। ঘরে তিথির বড় মামা বিরক্ত মুখে বসে আছেন। শুধু বসে আছেন বললে ভুল হবে পাইপ টানছেন। পাইপের ধোয়ায় ঘর অন্ধকার। এয়ার কুলার বসানো ঘরে দরজা জানালা বন্ধ থাকে। ধোয়া ঘর থেকে বেরুতে পারে না।

তিথির বড় মামা সাইদুর রহমান আর্মি শর্টকোর্সে মিলিটারীতে ছিলেন। দশ বছর চাকরির পর লেফটেন্যান্ট কর্ণেল হয়ে রিটায়ার করেছেন। বর্তমানে ব্যবসা করেন। সারাক্ষণই বলেন, ব্যবসার অবস্থা ভয়াবহ। কিন্তু তিনি ভয়াবহ অবস্থায় আছেন বলে মনে হয় না। ধানমন্ডিতে আশি লক্ষ টাকায় দশ কাঠা জমি কিনেছেন। সেখানে পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ি হবে। প্রতি তলায় দু'টা করে ফ্ল্যাট। একেকটি বিক্রি হবে চল্লিশ লক্ষ টাকায়। এর মধ্যে ৬টি বিক্রি হয়ে গেছে। উত্তরার কাছে উত্তরখান নামের জায়গায় ছ' বিঘার মত জমি কিনেছেন। সেখানে বাগান-বাড়ি হচ্ছে। বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। সামনে ঝিল, ঝিলে নৌকা। বলতে গেলে হুলুস্থুল ব্যাপার। যে এমন হুলুস্থুল ব্যাপার শুরু করে তার মুখে সারাক্ষণ বিজনেসের অবস্থা ভয়াবহ — এই কথা শুনতে ভাল লাগে না। জাফর সাহেবের অসহ্য লাগে। তিনি রিটায়ার্ড লেফটান্যান্ট কর্ণেল সাইদুর রহমানকে দু' চোখে দেখতে পারেন না। মাস খানিক আগে সাইদুর রহমানের ছোটমেয়ে পিঙ্গলার জন্মদিন উপলক্ষ্যে রিভার ক্রুজ হল। জাহাজে করে পাগলা থেকে চাঁদপুরে যাওয়া এবং ফিরে আসা। রিভার ক্রুজে সবাই গিয়েছে তিনি যাননি। শরীর খারাপের অজুহাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে

দিয়েছেন।

সাইদুর রহমান জাফর সাহেবকে দেখে মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। জাফর সাহেব বললেন, খবর সব ভাল?

সাইদুর রহমানের ভ্রু কুঁচকে গেল। তিনি পাইপে নতুন করে তামাক ভরতে লাগলেন। জাফর সাহেব বললেন, কতক্ষণ হল এসেছেন?

'অনেকক্ষণ। আমি এসেছি আটটা চল্লিশে এখন বাজে ন'টা পঞ্চাশ। তুমি কি সবসময়ই অফিসে এমন দেরী করে আস?'

অপমান সূচক প্রশ্ন। এ জাতীয় প্রশ্নের জবাব দেয়াও এক ধরনের অপমান। জাফর সাহেব বললেন, চা দিতে বলব চা খাবেন?

'চা খেতে পারি।'

বেয়ারাকে চায়ের কথা বলে জাফর সাহেব নিজের চেয়ারে বসলেন। তিনি খানিকটা চিন্তিত। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল সাহেব ঠিক কি উদ্দেশ্য এসেছেন বোঝা যাচ্ছে না।

সাইদুর রহমান পাইপে লম্বাটান দিয়ে বললেন, আমি তোমার বাসাতেই যেতাম। শেষ পর্যন্ত অফিসে আসলাম। কিছু ট্যাকনিক্যাল কথাবার্তা আছে যা অফিসে বলা যায় না।

'কি ট্যাকনিক্যাল কথা?'

'আমি অনেকদিন থেকেই ভাবছি — তোমার সঙ্গে একটা ফুল ডিসকাশান হওয়া উচিত। তোমার কি বলার আছে আমি শুনতে চাই। এক তরফা কথা শুনলে তো হবে না।'

'এক তরফা কি কথা শুনেছেন? আমি বুঝতে পারছি না।'

'চা আসুক। তারপর বলি।'

সাইদুর রহমান চোখ বন্ধ করে পাইপ টানছেন। জাফর সাহেবের ইচ্ছা করছে তাঁর বেয়ারাকে ডেকে বলেন, এই হামবাগটাকে ঘাড় ধরে ঘর থেকে বের করে দাও। বের করে দেবার পর যে চেয়ারে হামবাগটা বসেছে সেটা ডেটল পানিতে ধুয়ে দাও। মনে যা ভাবা যায় অধিকাংশ সময়ই তার উল্টোটা করতে হয়। জাফর সাহেব বেয়ারাকে তাড়াতাড়ি চা আনতে বললেন। সাইদুর রহমান বললেন, তোমার ঘরের দরজায় কি লালবাতি জ্বালানোর সিস্টেম আছে? সিস্টেম থাকলে লালবাতী জ্বালিয়ে দাও — আমি চাইনা আমার কথাবার্তায় ইনটারাপসান হোক।

'আপনার এমন কি কথা যে লালবাতি জ্বালিয়ে বলতে হবে?'

সাইদুর রহমান আবার ভ্রু কুঁচকে ফেললেন। চা এসে গেছে। তিনি এক চুমুক খেয়ে বললেন, চা তো ভাল বানিয়েছে। যাবার সময় আরেক কাপ খেতে হবে। মনে

করিয়ে দিও তো।

'মনে করিয়ে দেব। এখন বলুন কি ব্যাপার? লালবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছি ঘরে কেউ ঢুকবে না।'

সাইদুর রহমান গম্ভীর গলায় বললেন, শায়লা আমাকে কমপ্লেইন করেছে তুমি না-কি তাকে মারধর কর। ব্যাপারটা কি?

'ও আপনাকে বলেছে?'

'না বললে তো জানতে পারতাম না। আমার কাছে ওহী নাজেল হয় নি। আমি শায়লার কথা শুনে স্তম্ভিত। যার মেয়ে এম. এ. পাশ করেছে তাকে মারধোর করতে সাহস লাগে। তোমার সাহস আছে বোঝা যাচ্ছে। You are a courageous man.

'আপনি কি আমাকে শাস্তি দিতে এসেছেন?'

'না। শাস্তির প্রশ্ন আসে না। তবে শায়লা তোমাকে শাস্তি দিতে চায়। সে ঠিক করেছে তোমার সঙ্গে আর বাস করবে না। এই কথাটাই তোমাকে বলতে এসেছি।'

'বলুন শুনছি।'

'ও যা চাচ্ছে তা হল সে তার মেয়েদের নিয়ে থাকবে তুমি আলাদা কোথাও থাকবে। বাড়ি ভাড়া করে থাকতে পার। কিংবা কোন হোটেলে ঘর নিয়ে থাকতে পার। এবং আমার কাছে মনে হয় এটা দু'জনের জন্যেই মঙ্গলজনক হবে। সমস্যার ভদ্র সমাধান হবে। কিছুদিন এই ভাবে থাকার পর লোকলজ্জার ভয়েই হোক কিংবা মেয়েদের কারণেই হোক আবার তোমরা একত্রে থাকা শুরু করতে পারবে।'

'শায়লা এটা চায়?'

'সে যা চায় তা ভয়াবহ। সে চায় ডিভোর্স। তারতো এম্নিতেই মাথা গরম। উকিল ডেকে এনে হুলুস্থূল কাণ্ড! বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে এটাতে রাজি করিয়েছি।'

'আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে?'

'শায়লা তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছে। চিঠি আমার সঙ্গেই আছে। চিঠিটা পড়। চিঠিতে সব লেখা আছে। আমি নিজেও পড়েছি। উচিত হয়নি, তবু পড়লাম।'

সম্বোধন হীন চিঠি। ইংরেজিতে লেখা। জাফর সাহেবের মনে হল তিনি অপরিচিত কোন মেয়ের লেখা চিঠি পড়ছেন। তাঁর পা কাঁপতে লাগল। শায়লা এসব কি শুরু করেছে। শুরুর লাইনটি হল —

> **I always longed for Love, never got it . . .**
>
> *আমি সবসময় ভালবাসার জন্যে তৃষ্ণিত ছিলাম, কখনো তা পাইনি। তুমি আমার জীবনে রোবট স্বামী হিসেবে এসেছ। আমাদের দু'জনের মধ্যে সামান্যতম মিলও ছিল না। আমি বেড়াতে পছন্দ করি, তুমি ঘরে বসে থাকতে পছন্দ কর। আমি গান ভালবাসি — গান শুনলে*

তোমার মাথা ধরে যায়। তোমার সঙ্গে থেকে থেকে আমার নিজের জীবনটাও রোবটের মত হয়ে গেছে। তুমি আমাকে বদলে দিয়েছ। আমি তোমাকে বদলাতে পারি নি। বরং আমি তোমার মধ্যে ক্রোধ ঘৃণা এইসব নিম্নস্তরের আবেগ তৈরী করেছি যা বেড়ে বেড়ে এখন এই পর্যায়ে এসেছে যে তুমি আমার গায়ে হাত তুলতে দ্বিধা করছ না। গায়ে হাত তোলার ব্যাপারটি যে এবারই প্রথম ঘটেছে তা না। আগেও ঘটেছে। তোমার মনে নেই। সেই সময় তুমি রাগে অন্ধ হয়ে থাক। এমন রাগের মুহূর্তে মানুষ স্মৃতি শূন্য হয়ে পড়ে। সে কি করে না করে তা সে বলতে পারে না। প্রচণ্ড রাগ তোমার আগে ছিল না। যতই দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে। আমার জন্যেই যে বাড়ছে তাও আমি বুঝতে পারছি। আমিতো নির্বোধ নই। কোনকালে ছিলাম না। বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত তুমি কখনো আমাকে ভালবেসেছ বলে আমি মনে করি না। তুমি আমাকে সহ্য করে গিয়েছ এই পর্যন্ত। এখন তাও পারছ না। পরে কি হবে ভাবতেও আমার ভয় হচ্ছে।

কাজেই আমি মনে করি "আর কখনোই আমরা একত্রে বাস করব না" এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত দু'জনের জন্যেই মঙ্গল জনক হবে। যে ফ্ল্যাট বাড়িতে আমরা বাস করছি তুমি নিশ্চয়ই জান সে ফ্ল্যাট বাড়ি আমার টাকার কেনা। আমার বাবা আমাকে যে টাকা দিয়েছেন সেই টাকায়। কাজেই এ বাড়িতে তোমার কোন অধিকার থাকার কথা না। তুমি অন্য কোথাও চলে যাবে। আমাদের টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করার তোমার প্রয়োজন নেই। আমার যা আছে তা দিয়ে আমি আমার মেয়েদের নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারব।

সাইদুর রহমান বললেন, চিঠি পড়েছ?

'জ্বি।'

'শায়লার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। সেই সব আর তোমাকে বলতে চাচ্ছি না। তোমার কিছু বলার আছে কি না বল।'

'না।'

'বেশ আমি তাহলে উঠব।'

'যাবার আগে এক কাপ চা খেয়ে যাবেন বলেছিলেন। দিতে বলি।'

'না থাক। চিঠিটা টেবিল থেকে পড়ে গেছে। তুলে রাখ। এই চিঠি অন্যের হাতে

যাওয়া ঠিক না।'

তিথি দুপুরে বাবার কাছে এসে দেখে জাফর সাহেব গম্ভীর মুখে বসে আছেন। তিথি বলল, কি হয়েছে বাবা?

জাফর সাহেব চোখ তুলে তাকালেন। মনে হল মেয়েকে চিনতে পারছেন না।

তিথি বলল, তোমার কি হয়েছে বাবা?

'কিছু হয়নি।'

'আমি ছবি নিয়ে এসেছি।'

'কিসের ছবি?'

'পাসপোর্ট সাইজ ছবি।'

'ও আচ্ছা, আচ্ছা। চল যাই . . . ।'

'ট্রেনের টিকিট করেছ?'

'না, টিকিট করা হয়নি।'

'কখন করবে?'

'শরীরটা ভাল লাগছে না। যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'তুমি যাবে না?'

জাফর সাহেব ইতস্ততঃ করে বললেন, এক কাজ কর্। তুই চলে যা।

'আমি একা যাব?'

'হ্যাঁ। ফার্স্ট ক্লাসে যাবি। দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকবি। অসুবিধা কি? গাধাটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যা।'

'তুমি সত্যি যাবে না?'

'না।'

'ঠিক করে বল তো – তোমার কি এর মধ্যে মা'র সঙ্গে কোন কথা হয়েছে?'

'না।'

'আমার দিকে তাকিয়ে বল। অন্যদিকে তাকিয়ে বলছ কেন? কথা হয়েছে মা'র সঙ্গে?'

জাফর সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত গলায় বললেন, না, কোন কথা হয়নি। চল্ যাই। দু'টার সময় অফিস বন্ধ করে দেয়।

'তোমাকে অন্য রকম লাগছে। কি হয়েছে বল তো?'

'কিছু হয়নি। কিছু হয়নি।'

পাসপোর্ট অফিসের কাজ সেরে জাফর সাহেব বললেন, চল্, তোর সঙ্গে খানিকক্ষণ ঘুরি। আজ আর অফিসে ফেরত যাব না।

তিথি বিস্মিত হয়ে বলল, আমার সঙ্গে কোথায় যাবে?

'তোরা কোথায় কোথায় বেড়াতে যাস তা তো জানি না। তুই আমাকে কোথাও নিয়ে যা। তার আগে চল্ কোথাও খেতে যাই।'

'তুমি তো দুপুরে কিছু খাও না।'

'আজ খাব। খিদে লেগেছে।'

'চাইনীজ খাবে?'

'হুঁ।'

'তুমি সত্যি তাহলে সিঁলেট যাবে না?'

'না। তুই যা। গাধাটাকে সাথে করে নিয়ে যা।'

'তুমি একা একা থাকবে?'

'হুঁ। এক দিনেরই তো ব্যাপার। তোরা তো চলেই আসবি।'

'আমিও থেকে যাই। মা'কে টেলিফোন করে আসতে বলি।'

'টেলিফোন করলে আসবে না। তোকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হবে। আমাকে যেভাবে সব গুছিয়ে বললি, তোর মা'কেও সেইভাবে বলবি। তারপর সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। নুরুজ্জামান গাধাঁটাকে খবর দেয়া দরকার। গাধাঁটা এখন আছে কোথায়?'

'দিনে কোথায় থাকে তা তো বাবা জানি না। জিজ্ঞেসও করিনি। রাতে ফিরে আসে। হাতে করে দু'টা আনারস ঝুলিয়ে আনে। ভাত খায় না। আনারস খায়।'

'বলিস কি!'

'সত্যি বাবা।'

তিথি মিট্ মিট্ করে হাসছে। তিথির হাসি-হাসি মুখের দিকে আনন্দ এবং বিস্ময় নিয়ে জাফর সাহেব তাকিয়ে আছেন। বিস্ময়ের কারণ হল, তার মেয়ে যে এত সুন্দর করে হাসে তা তিনি আগে কখনো লক্ষ্য করেন নি। অন্য মেয়ে দু'টি কেমন করে হাসে কে জানে? এরাও কি তিথির মত সুন্দর করে হাসে?

দুপুরবেলা চাইনীজ রেস্টুরেন্টগুলি ফাঁকা থাকে। আজ আরো ফাঁকা। দোতলার হলঘরে একটা লোকও নেই। তিথি বলল, অন্য কোথাও চল তো বাবা। ফাঁকা ঘরে চাইনীজ খেতে ভাল লাগে না।

'ফাঁকাই তো ভাল। নিরিবিলি।'

'হোটেলের নিরিবিলি অসহ্য লাগে। হোটেল থাকবে গমগমা, লোকজনে ভর্তি।'

'তাহলে চল্ লোকজনে ভর্তি গমগমা হোটেল খুঁজে বের করি।'

'চল যাই গাড়ি ছেড়ে দাও বাবা। আমরা রিকশা করে ঘুরব।'

জাফর সাহেব গাড়ি ছেড়ে দিলেন। রিকশায় উঠেই তিথি বলল, তুমি কি চাইনীজ খাওয়া নিয়ে এই গল্পটা শুনেছ?

'কোন গল্প?'

ঢাকা শহরে এক লোক হঠাৎ আলাউদ্দিনের চেরাগ হাতে পেয়ে গেল। চেরাগে ঘসা দিতেই দৈত্য এসে উপস্থিত। দৈত্য বলল, জাহাপনা, কি চাই বলুন। হুকুম করুন। হুকুম করলেই হুকুম তামিল হবে।

লোক বলল, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। কিছু খাবার আন।

দৈত্য বলল, কি খাবার খাবেন হুকুম করুন হুজুরে আলা।

'চাইনীজ খাব।'

দৈত্য অস্বস্তির সঙ্গে বলল, সত্যি চাইনীজ খাবেন?

'অবশ্যই খাব। তোমার অসুবিধা আছে?'

'জ্বি না। তবে একটু সময় লাগবে।'

'লাগুক। খাবার যেন ফ্রেশ হয়।'

'অবশ্যই ফ্রেশ হবে।'

লোকটা খাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। ঘন্টা খানেক পর দৈত্য ঘাড়ে করে এক আধ-বুড়ো চাইনীজ নিয়ে উপস্থিত। দৈত্য বলল, হুজুরে আলা, চাইনীজ খেতে চেয়েছেন। চাইনীজ ধরে নিয়ে এসেছি। এক্কেবারে পিকিং থেকে এনেছি বলে বিলম্ব হয়েছে। এখন ব্যাটাকে খান। আমি দেখি।

জাফর সাহেব শব্দ করে হাসলেন। তিথি হাসছে। রিকশাওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে। জাফর সাহেব তাঁর হাসি থামাতে পারছেন না। যতবারই হাসি থামাতে যান ততবারই চোখের সামনে ভেসে উঠে আধবুড়ো চাইনীজটার হতভম্ব মুখ।

তিথি বলল, বাবা থাম তো। অনেক হেসেছ।

জাফর সাহেব হো হো, হা হা করে হাসতেই লাগলেন।

'প্লীজ বাবা, থাম। তোমাকে নিয়ে তো ভাল যন্ত্রণায় পড়া গেল। আগে জানলে কে তোমাকে হাসির গল্প বলতো!

'মা, আরেকটা গল্প বল তো। হো হো হো। হি হি হি।'

তিথি অবাক হয়ে বাবাকে দেখছে। আশ্চর্য, এত হাসি! তিথি তার বাবাকে এমন করে কখনো হাসতে দেখেনি। তাঁর শরীর ভাল তো? অসুস্থ মানুষ মাঝে মাঝে এমন করে, সামান্য কারনে প্রচুর হাসে। প্রচুর কাঁদে। তিথি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বলল, বাবা, নুরুজ্জামান সাহেবকে যে নিয়ে যাব — উনি থাকবেন কোথায়? ধর, এক রাত আমাদের সিলেট থাকতে হল। তখন কি করব? উনাকে কি কোন হোটেলে পাঠিয়ে দেব?

জাফর সাহেব হাসি থামাতে পারছেন না। অনেক কষ্টে হাসির ফাঁকে ফাঁকে বললেন, গাধাটাকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেন থেকে ফেলে দিবি — হি হি হি ।

কি কথার কি উত্তর! কি হয়েছে বাবার?

নুরুজ্জামান মুগ্ধ চোখে চিড়িয়াখানার জলাধারের পাশে দাঁড়িয়ে। জলহস্তী পরিবারের কাণ্ডকারখানায় সে মুগ্ধ ও বিস্মিত। কিছুক্ষণ পর পর সে বলছে, 'কি আজিব জানোয়ার!' তার ইচ্ছা করছে কলা বা বাদাম কিনে এদের খাওয়ায়। বাইরে সাইনবোর্ড ঝুলছে — "চিড়িয়াখানার পশুদের কিছু খাওয়াবেন না।" নোটিশ না থাকলে সে অবশ্যই কলা বা এই জাতীয় কিছু কিনে খাওয়াতো। এরা ফল-মূল খায় কি-না কে জানে। পানির জানোয়ার, মাছ খাওয়ারই কথা। তবে পানির জানোয়ার হলেও শুকনাতেও এরা অনেকক্ষণ থাকে। কাজেই স্থলভূমির খাবার খেতেও পারে। কাকে জিজ্ঞেস করা যায়? চিড়িয়াখানার লোকজন নিশ্চয়ই জানবেন। নুরুজ্জামান চিড়িয়াখানার লোকজনদের খোঁজে বের করত। তার হাতে সময় বেশি নেই। সন্ধ্যা ৭ টায় মন্ত্রী সাহেবের সঙ্গে এপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। পি. এ সাহেবের স্ত্রী ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কথা ছিল — এপায়েন্টমেন্ট হয়ে গেলে পি. এ সাহেব টেলিফোন করে জানাবেন। তা জানান নি। টেলিফোন নাম্বার হারিয়ে ফেলেছিলেন। নুরুজ্জামান আবার খোঁজ নিতে গিয়ে ব্যাপারটা জানল। ভাগ্যিস খোঁজে নিতে গিয়েছিল! মিনিস্টার সাহেবের আবার জাপান চলে যাবার কথা।

জলহস্তী কি খায় এই তথ্য নুরুজ্জামান বের করতে পারছে না। এই পর্যন্ত দু'জনকে জিজ্ঞেস করল। প্রথমজন তাকে রীতিমত অপমানই করল। সে বলল, জলহস্তী কি খায় তা দিয়ে আপনার কি দরকার? আপনি কি জলহস্তী?

দ্বিতীয়জন এ জাতীয় অপমান করল না। সে বলল, জানি না। সে বালতিতে করে কুচি কুচি করে কাটা লাউ নিয়ে যাচ্ছে। কাকে খাওয়াবে কে জানে? লাউ কে খায়?

নুরুজ্জামান ঠিক করল আরেকদিন এসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকবে। এর মধ্যে একসময় না একসময় জলহস্তীকে খাবার দেবেই। তখন দেখে নিলেই হবে। আজ থাকা যাবে না। মিনিস্টার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে। এক্ষুণি রওনা দেয়া দরকার।

শিক্ষামন্ত্রী চৌধুরী নবী নেয়াজ খান বিরক্ত মুখে বসে আছেন। তাঁর আলসার আছে। বিকেলের পর থেকে আলসারের ব্যথাটা জানান দেয়। ব্যথা তেমন তীব্র নয়, তবে অস্বস্তিকর। বিকেল থেকে আলসারের ব্যথার থেকেও তীব্র ব্যথা শুরু হয়। সেটা হল দর্শনার্থীর যন্ত্রণা। দেশটার কি হয়েছে কে জানে? অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আজকাল লোকজন মন্ত্রীর কাছে চলে আসে।

গতকাল একজন এসেছিল — তার টেলিফোনে বিল বেশি হচ্ছে। বিল বেশি হচ্ছে তো তিনি কি করবেন? তিনি টেলিফোনের মন্ত্রী না। তাঁর হল শিক্ষা দপ্তর। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর কাছে আসা যায়। তাও ছোটখাট কিছু নিয়ে না। বড় কিছু —। তা আসবে না। তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়ে আসবে — সময় নষ্ট করবে। গত সপ্তাহে একজন আসল ক্লাস ফোরের ধর্ম বইয়ে ভুল আছে এই খবর নিয়ে। একা আসে নি। সঙ্গে বিরাট দল। তুমুল হৈ-চৈ।

'স্যার বলুন, আপনি বলুন, আরবিতে কি 'ভ' আছে?'

তিনি তাৎক্ষণিকভাবে মনে করতে পারলেন না আরবীতে 'ভ' আছে কি-না। মনে মনে আলিফ বে তে ছে পড়তে লাগলেন —

'স্যার আপনি বলুন — আছে 'ভ'?'

তিনি অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, মূল ব্যাপারটা বলুন।

'সূরা নাস-এর বাঙলা উচ্চারণ লিখেছে — "মিন শার্‌রিল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাসিল লাযি ইউয়াসভিসু ফী সুদূরিন্নাস। দেখুন অবস্থা — ইউয়াসভিসু। লেখা উচিত ইউয়াসফিসু। 'ফ'য়ের জায়গায় হয়েছে ভ।'

তিনি বললেন, হুঁ।

'জরুরী ব্যবস্থা নিতে হবে স্যার। ছাত্ররা খোদার পাক কালাম ভুল শিখবে —?'

তিনি আবারও বললেন, হুঁ।

'আপনি স্যার এই বই নিষিদ্ধ করুন। নতুন করে বই ছাপা হবে, তারপর ছাত্ররা পড়বে।'

'ছোটখাট ভুল তো থাকতেই পারে। শিক্ষকরা সেগুলি শুধরে দেবেন।'

'আপনি কি বলছেন স্যার! খোদার পাক কালামে ভুল থাকবে? এটা কি স্যার বিবেচনার কথা হল? . . .'

প্রতিদিন এরকম কিছু সমস্যা নিয়ে তাঁকে সময় নষ্ট করতে হয়। আর শুনতে হয় তদবির। কত ধরনের তদবির নিয়ে লোকজন যে আসে তা আল্লাহ জানেন এবং তিনিই জানেন।

'স্থানীয় দারোগা ঘুষ খাচ্ছে। তাকে বদলি করতে হবে।'

'সেই একই দারোগা অত্যন্ত সৎ। তাকে এখানেই রাখতে হবে।'

'এজি অফিসে টিএ বিল আটকে রেখেছে। বিল পাশ করতে হবে।'

'অমুক ছেলে সন্ত্রাসী মামলায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। অতি ভাল ছেলে। পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে। শেষ রাতে ফজরের নামাজ পড়তে বের হয়েছিল, টহল পুলিশ ধরে ফেলেছে। লম্বা চুল দেখে সন্দেহ করেছে। আশেপাশের লোকজনের শত্রুতাও আছে। তারাও তাল দিয়েছে। কিন্তু ছেলে সরকার পার্টি করে। আপনি স্যার এক্ষুণি আই. জি. সাহেবকে টেলিফোন করুন। আপনি না বললে আমাদের অন্য সোর্স ধরতে হবে।'

চৌধুরী সাহেব সন্ধ্যা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে দেন-দরবার শুনেন। সন্ধ্যা থেকে তাঁর মাথাধরা শুরু হয়। রাত ন'টায় সেই ব্যথা অসহনীয় হয়ে উঠে। তিনি এক সঙ্গে দু'টা প্যারাসিটামল এবং একটা সিডাকসিন খেয়ে বাতি নিভিয়ে চুপচাপ চেয়ারে বসে থাকেন। মাথাব্যথা খানিকটা কমলে এশা'র নামাজ পড়েন। চার রাকাত নামাজ, তাতেই গণ্ডগোল হয়ে যায়। ক' রাকাত পড়েছেন তার হিসাব থাকে না। তাঁর ধারণা, প্রতিবারই চার রাকাতের জায়গায় তিনি হয় তিন রাকাত কিংবা পাঁচ রাকাত পড়েন। একবার অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, তিনি রুকুতে দাঁড়িয়ে সুরা ফাতিহা বাদ দিয়ে আত্তাহিয়াতু পড়েছেন। মাথা-খারাপের লক্ষণ ছাড়া আর কি?

আজ সন্ধ্যা থেকেই তার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। তিনি পি. এ.-কে বললেন, আজ আর কাউকে পাঠিও না। শরীর খারাপ।

'কাউকেই না?'

'আচ্ছা পাঠাও। এতক্ষণ ধরে বসে আছে।'

'আপনি স্যার শুধু শুনে যান। আমিও বলে দেব যেন বেশিক্ষণ আপনাকে বিরক্ত না করে।'

'রাত আটটার পর আর কাউকে পাঠাবে না।'

'জি আচ্ছা স্যার।'

নুরুজ্জামান মন্ত্রীর ঘরে ঢুকল রাত ঠিক আটটায়। ঢুকেই সে বলল, স্যার, আপনার কি শরীর খারাপ?

চৌধুরী সাহেব দর্শনপ্রার্থীর মধ্যে এই প্রথম এ-জাতীয় কথা শুনলেন। অন্যরা ঘরে ঢুকেই তাদের সমস্যার কথা বলতে শুরু করে। সময় নষ্ট করতে চায় না।

চৌধুরী সাহেব বললেন, আপনি বসুন।

নুরুজ্জামান বলল, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার শরীরটা খুবই খারাপ। স্যার, আমি আরেকদিন আসব।

'শরীর এমন কিছু খারাপ না। বসুন।'

নুরুজ্জামান বলল, আপনার ঘরে খুব ভয়ে ভয়ে ঢুকেছিলাম। মন্ত্রীর ঘর। মন্ত্রীদের আগে শুধু দূর থেকে দেখেছি।

'ভয় কেটেছে?'

'জ্বি স্যার, কেটেছে।'

চৌধুরী সাহেব বেল টিপে দু'কাপ চা দিতে বললেন। নুরুজ্জামান বলল, স্যার, আমি চা খাই না। গ্রামাঞ্চলে থাকি। চায়ের অভ্যাস হয় নাই।

'অভ্যাস না হলেও খান। মন্ত্রীর ঘরের চা খেয়ে দেখুন কেমন লাগে। দেশে ফিরে গল্প করতে পারবেন। বলতে পারবেন, মন্ত্রী সাহেব আমাকে খুব খাতির করেছেন। নিজের হাতে চা বানিয়ে খাইয়েছেন।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার, চা খাব।'

চৌধুরী সাহেব চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আবেগশূন্য গলায় বললেন, এখন বলুন দেখি কি তদবির নিয়ে এসেছেন।

'একটা স্কুলের ব্যাপারে এসেছি স্যার। আমি একটা গার্লস স্কুল দিয়েছি। নাম দিয়েছি বেগম রোকেয়া গার্লস হাইস্কুল। পায়রাবন্দের বেগম রোকেয়া।'

'ব্যাখ্যা লাগবে না। বেগম রোকেয়ার নাম আমি জানি। শিক্ষামন্ত্রী মানেই যে মূর্খ হতে হবে এমনতো কথা নেই।'

'আগে নাম ছিল মমিনুন্নেছা গার্লস হাইস্কুল। মমিনুন্নেছা আমার ফুপুর নাম। তারপর শেষ রাতে একটা স্বপ্ন দেখে নামটা বদলে দিলাম।'

'স্বপ্নে দেখলেন বেগম রোকেয়া আপনাকে বলছেন — তাঁর নামে স্কুলের নাম রাখতে?'

'জ্বি-না। ব্যাপারটা কি আপনাকে বলব?'

'বলুন। যতক্ষণ আমি চা খাব ততক্ষণই বলবেন। চা শেষ হওয়া মাত্র আপনার ইতিহাস বর্ণনা বন্ধ করবেন এবং চলে যাবেন। পারবেন না?'

'পারব স্যার। আমার ফুপু মমিনুন্নেছা খুব দুঃখী মহিলা স্যার। বিয়ের দু' বছরের মধ্যে স্বামী মারা গিয়েছিল। তাঁর তখন দু'টা জমজ সন্তান — একটা ছেলে একটা মেয়ে। মেয়েটার নাম সাবেরা, ছেলেটার নাম . . . '

'নামের দরকার নেই। বলে যান। নাম বলতে গিয়ে সময় নষ্ট করছেন। আমার চা প্রায় শেষ হয়ে আসছে।'

'জমজ বাচ্চা দু'টাকে নিয়ে স্বামীর সংসারে পড়ে রইলেন। কোথাও গেলেন না। বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। বিয়েও করলেন না। বাচ্চা দু'টার বয়স যখন সাত বৎসর তখন দু'জন একসঙ্গে পানিতে ডুবে মারা গেল। ভাইটা পানিতে পড়ে

গিয়েছিল, তাকে বাঁচাতে গিয়ে বোনটাও মারা গেল।'

'বলেন কি?'

'তারপরেও ফুপু দীর্ঘদিন বেঁচে গেলেন। মারা গেলেন গত বৎসর শ্রাবণ মাসে। মরার সময় তাঁর সব জমি-জমা আমার নামে লিখে দিয়ে গেলেন। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি ভাবলাম, ফুপু খুব কষ্ট নিয়ে পৃথিবী থেকে গেছেন। তাঁর জন্যে যদি ভাল কিছু করতে পারি তাহলে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে। তখন তাঁর সবটা জমি আমি স্কুলের জন্যে দিয়ে দিলাম। স্কুলের নাম দিলাম ফুপুর নামে। তারপর স্বপ্ন দেখলাম।'

'কি স্বপ্ন দেখলেন?'

'স্যার দেখলাম, ফুপু খুব সুন্দর ঝকমকা শাড়ি পরা। কপালে টিপ। গা ভর্তি গয়না। গয়নার ভেতর লাল, নীল, সবুজ কত রকম পাথর। পান খেয়ে ফুপুর ঠোঁট টকটকে লাল। ফুপু বললেন, ওরে নুরু, দেখ, কি সুন্দর সুন্দর গয়না আমার গায়।

আমি বললাম, ফুপু, আপনি মনে হয় খুব সুখে আছেন?

ফুপু বললেন, হ্যাঁরে বোকা, খুব সুখে আছি। স্বামী-সন্তান সব সঙ্গে আছে। তবে ছেলেটা বড় দুষ্টুমি করে। সারাদিন আছে খেলার মধ্যে। একে নিয়ে আমি চিন্তায় অস্থির। শাসনও করতে পারি না। শাসন করতে গেলেই তোর ফুপা ছুটে এসে বলে — কর কি, কর কি! আর আমার মেয়েও হয়েছে ভাই-সোহাগী। তার ভাইকে কিছু বললেই তার মুখ ভার। বড় যন্ত্রণায় আছি রে নুরু। বলেই ফুপু আনন্দে হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, আপনার আনন্দ দেখে ভাল লাগছে ফুপু।

ফুপু বললেন, তুই গরীব মানুষ, তোকে বিষয়-সম্পত্তি দিয়ে এসেছিলাম। তুই তো স্কুল করে বসে আছিস।

আমি বললাম, আপনার কি এটা পছন্দ না ফুপু?

ফুপু বললেন, অবশ্যই পছন্দ। তবে তুই আমার নাম দিয়েছিস, এটাতে খুব লজ্জায় পড়েছি। নামটা বদলে দে।

জ্বি আচ্ছা, দেব।

ফুপু তখন বললেন, কাছে আয় তো গাধা, তোর মাথায় হাত রেখে আমি একটু দোয়া করি।

আমি ফুপুর কাছে যাবার চেষ্টা করলাম, তখনই ঘুম ভেঙে গেল।

চৌধুরী সাহেবের চা শেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। তিনি স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন। তিনি দেখলেন, তাঁর সামনে বসে থাকা বোকাসোকা ধরনের মানুষটির চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। সে চোখের পানি মুছার জন্যে পকেট

থেকে রুমাল বের করতেই রুমালের সঙ্গে দু'টা গাছের পাতাও টেবিলে পড়ল। চৌধুরী সাহেব অন্য প্রসঙ্গে যাবার জন্যে বললেন, —

'গাছের পাতা পকেটে নিয়ে ঘুরছেন কেন?'

নুরুজ্জামান চোখ মুছতে মুছতে বলল, আমি স্যার পাতার বাঁশি বাজাই।

'তাই না-কি? দেখি বাজান তো পাতার বাঁশি।'

'আজ স্বপ্নটা আপনাকে বলায় মনটা খারাপ হয়ে গেছে। অন্য একদিন এসে বাঁশি শুনিয়ে যাব।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। অন্য একদিন আসবেন। বাঁশি শুনাবেন। স্কুলের কাজ নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমি করে দেব।'

চৌধুরী সাহেব লক্ষ্য করলেন, তাঁর মাথাধরা সেরে গেছে। শরীরটা ঝরঝরে লাগছে।

সুরমা মেল রাত সাড়ে দশটায় ছাড়বে। জাফর সাহেব দু'জনের একটা প্রথম শ্রেণীর স্লিপিং বার্থ রিজার্ভ করেছিলেন। এখন তিথি ঐ কামরায় একা যাবে। নুরুজ্জামান তার সঙ্গে যাচ্ছে তবে সে অবশ্যই অন্য কামরায় থাকবে। জাফর সাহেব বললেন, ভয় পাবি নাতো মা?

তিথি বলল, ভয় পাব কেন? আমি একাতো যাচ্ছি না। হাজার দু' এক যাত্রী আমার সঙ্গে যাচ্ছে।

'দ্যাটস ট্রু। দরজা বন্ধ করে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকবি। ঘুম ভাঙ্গলে দেখবি সিলেট রেল স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে।'

'তুমি আমাকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করবেনা তো বাবা।'

'আচ্ছা দুঃশ্চিন্তা করব না।'

'যেকোন কারণেই হোক — তুমি কোন ব্যাপার নিয়ে খুব আপসেট হয়ে আছ বলে আমার মনে হয়। আমি মা'কে নিয়ে আসি তারপর তোমাদের ঐ সব ঝগড়া — মন কষাকষি পুরোপুরি দূর করে দেব।'

জাফর সাহেব কিছু বললেন না। তিথি রাতের রান্না করতে চেয়েছিল। জাফর সাহেব রান্না করতে দিলেন না। তিনি হোটেল থেকে খাবার আনতে গেলেন। নুরুজ্জামান এখনো ফেরেনি। এ নিয়েও তিনি খানিকটা চিন্তিত বোধ করছেন। নুরুজ্জামান না ফিরলে তিথির যাওয়া তিনি বন্ধ করে দেবেন। তবে সে ফিরবে। তিথি বলেছে নুরুজ্জামান ঠিক সাড়ে ন'টার সময় হাতে একটা আনারস নিয়ে ফিরে আসে।

ঘড়িতে এখনো সাড়ে ন'টা বাজে নি। ন'টা দশ বাজে। হাতে সময় আছে। তিথির কাপড় গোছানোই আছে — তবু কোথাও যাবার আগে সমস্যা হয়। সব সময় দেখা যায় সব নেয়া হয়েছে শুধু জরুরি জিনিসটাই নেয়া হয় নি। টেলিফোনে অনেকক্ষণ ধরেই রিং হচ্ছে। তিথি বিরক্ত মুখে উঠে গেল। ওপাশ থেকে মারুফ উদ্বিগ্ন গলায় বলল, তিথি দুপুরে তুমি কোথায় ছিলে আমি এক লক্ষ বার টেলিফোন করেছি।

তিথি বলল, কেমন আছ?

'আমি কেমন আছি সেটা বড় ব্যাপার না। তুমি কেমন আছ?'

'ভাল।'

'গলা শুনে মনে হচ্ছে রাগ করেছ।'

'আমার কি রাগ করার মত কারণ নেই?'

'থাকতে পারে তবে আমার কারণে তোমার রাগ করার মত গ্রাউণ্ড নেই। ব্যাখ্যা করব?'

'দরকার নেই।'

'অবশ্যই দরকার আছে মন দিয়ে শোন।'

'শুনছি।'

'একটু ধরে থাক আমি সিগারেট ধরিয়ে নি। জাষ্ট এ সেকেণ্ড।'

তিথি রিসিভার ধরে আছে। মারুফ সিগারেট ধরাতে ধরাতে অতি দ্রুত ভেবে নিচ্ছে কি বলবে। তিথির কাছে সকালবেলা কেন আসে নি তা খুব গুছিয়ে বলতে হবে। আগে থেকে সে কিছু ভেবে রাখেনি। মারুফ দেখেছে তার তাৎক্ষণিক গল্প অনেক সুন্দর হয়। সে নিশ্চিত এবারো তাই হবে।

'তিথি!'

'হুঁ।'

'সরি তোমাকে স্ট্যাণ্ড বাই রেখে দিয়েছি। আসলে ভেজা সিগারেট। ধরাতে পারছিলাম না। কি হয়েছে শোন। সকালে ঘুম ভেঙে দেখি আমার অভিমান কুশলী পিতা বাসায় নেই। তাঁর ব্যাগ নিয়ে বিদায় হয়ে গেছেন। তবে আসল জিনিস ফেলে গেছেন।

'আসল জিনিস কি?'

'আসল জিনিস হল তাঁর মানিব্যাগ। মানিব্যাগ বালিশের নিচে রেখে ঘুমিয়েছিলেন। ঐটি ফেলে রেখে চলে গেছেন। আমার মাথায় সপ্ত আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। দু'ঘন্টার জন্যে চুক্তিতে একটা বেবীটেক্সি ঠিক করে বের হলাম পিতার খুঁজে। ইন সার্চ অব ফাদার। ঢাকার যেখানে যত আত্মীয় আছেন সবার বাসায় গেলাম।'

তিথি উদ্বিগ্ন গলায় বলল, উনাকে পাওয়া গেছে?

'পাওয়া গেল দুপুর একটা কুড়ি মিনিটে। আমার ঘড়িতে সেকেণ্ডের কাঁটা নেই। সেকেণ্ডের কাঁটা থাকলে সেকেণ্ডও বলে দিতাম। উনাকে কোথায় পাওয়া গেছে আন্দাজ করতো?'

'আন্দাজ করতে পারছি না?'

'হাসপাতালে। শেষ চেষ্টা হিসেবে আমি হাসপাতালগুলিতে একবার খোঁজ নিলাম। ভাগ্য ভাল প্রথম খোঁজ করলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে —

সেখানেই পাওয়া গেল।'

'বল কি?'

'আমার রাগী পিতা — রাগে এবং প্রখর রৌদ্র তাপে মাথা ঘুরে রাস্তায় পরে গিয়েছিলেন। সহৃদয় জনগন তাঁকে হাসপাতালে রেখে গেছে তবে তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগটি নিয়ে গেছে।'

'এখন উনি কেমন আছেন?'

'ভাল আছেন। কয়েকটা স্যালাইন শরীরে যাবার পর নড়ে চড়ে উঠেছেন। এখন আবদার ধরেছেন কোরান শরীফ পাঠ করবেন। আমাকে লক্ষ্মৌ টাইপের একটা কোরান শরীফ জোগাড় করে দিতে হবে।'

'লক্ষ্মৌ টাইপটা কি?'

'দু' ধরনের টাইপে কোরান শরীফ ছাপা হয় — একটা কোলকাতা টাইপ একটা লক্ষ্মৌ টাইপ। তিথি তুমি কি একটু ধরবে আমার সিগারেট নিভে গেছে ধরিয়ে নেই। তিথি রিসিভার ধরে আছে। মারুফ সিগারেট ধরাতে ধরাতে এতক্ষণ কি বলল্ তা গুছিয়ে নিল। কোরান শরীফের ব্যাপারটা সে হঠাৎ করে নিয়ে এসেছে। বড় ধরনের মিথ্যা বলার এক পর্যায়ে কোরান শরীফ নিয়ে এলে সুবিধা হয়। যারা মিথ্যাটা শুনছে তারা নিশ্চিত হয় এটা মিথ্যা না। কোন মুসলমান ছেলে সংস্কারের কারণেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক কোরান শরীফ জড়িয়ে মিথ্যা বলে না।

'হ্যালো তিথি!'

'হুঁ।'

'শুনলেতো আমার ঘটনা?'

'শুনলাম। আই এ্যাম সরি।'

'তুমি কেন সরি হবে। সরি হলাম আমি। আমার যে কি খারাপ লাগছিল তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।'

'আমি বুঝতে পারছি।'

'না তুমি বুঝতে পারছ না। যাই হোক এখন তোমার খবর বল।'

'আমার বলার মত কোন খবর নেই। আমি কিছুক্ষণ পর সিলেট রওনা হচ্ছি।'

'কোথায় রওনা হচ্ছ?'

'সিলেট?'

'কেন?'

'মা'কে নিয়ে আসতে যাচ্ছি। বিয়ের ব্যাপারটা মা'কে বলতে হবে না? বাবাকে রাজি করিয়েছি। মা'কে রাজি করাতে হবে। মজার ব্যাপার কি জান। সিলেট যাচ্ছি আমি একা।'

'একা মানে?'

'একা মানে একা। অল বাই মাইসেলফ। বাবা আর আমি আমাদের দু'জনের যাবার কথা ছিল। এখন ঠিক হয়েছে বাবা যাবেন না। আমি একা যাব। একটা স্লিপিং বার্থ রিজার্ভ করা আছে।'

'তিথি!'

'বল।'

'আমি কি যেতে পারি তোমার সঙ্গে? প্রথমত একা একা তুমি রাতের ট্রেনে যাবে ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে। দ্বিতীয়ত সারারাত গল্প করতে করতে যাওয়ার আলাদা আনন্দ আছে।'

'সারারাত গল্প করার আনন্দতো অনেক পাবে।'

'তা পাব, তবে সেটা হবে বিয়ের পরে। বিয়ের আগে সারারাত গল্প করার আনন্দ অন্য রকম।'

'তুমি জানলে কি ভাবে?'

'অনুমান করছি। কল্পনায় বুঝতে পারছি। প্রকৃতি আমাকে কল্পনা করার অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন। তোমার ট্রেন ক'টায়?'

'রাতে সাড়ে দশটায়।'

'আমি ঠিক দশটার সময় কমলাপুর রেল স্টেশনে উপস্থিত থাকব।'

'আরে না না। অসম্ভব।'

'শোন তিথি, নেপোলীয়ান যখন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে আল্পস পর্বতমালার সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং ঠিক করলেন তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে পর্বতমালা অতিক্রম করবেন তখন তাঁর সেনাপতিরা বলল, এটা অসম্ভব। তাঁর উত্তরে তিনি বললেন, অসম্ভব হচ্ছে এমন একটি শব্দ যা শুধু বোকাদের অভিধানেই পাওয়া যায়।'

'নেপোলীয়ানের পক্ষে যে কথা বলা সম্ভব তা-কি তোমার পক্ষে বলা সম্ভব? তুমিতো নেপোলীয়ান না।'

'কে বলল আমি নেপোলীয়ান না। আমি অবশ্যই নেপোলীয়ান। আমি ঠিক দশটায় ট্রেনে চেপে বসব। সারারাত গল্প করব। তুমি মনে করে ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা নেবে।'

'মারুফ শোন, দয়া করে এই কাজটা করবেনা। প্লীজ। প্লীজ।'

'স্টেশনে দেখা হবে।'

মারুফ টেলিফোন নামিয়ে রাখল। আজ তার মনটা খুব ভাল। আজিজ সাহেবের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা নেয়া হয়েছে। 'নীলা' পাথর কেনার টাকা। বিয়েতে কাজে লাগবে। পরে সুন্দর কোন গল্প বলে আজিজ সাহেবকে ঠাণ্ডা করলেই হবে।

জাফর সাহেব মেয়েকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন। তিথি অস্বস্তিতে মরে যাচ্ছে যদি মারুফের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। বাবাকে তাহলে সে কি বলবে? বাবাই বা কি মনে করবেন? তিথি ভয়ে ভয়ে চারদিক দেখছে — মারুফকে দেখা যাচ্ছে না। এত মানুষের মাঝে চট করে দেখা পাওয়াও মুশকিল। কোথাও নিশ্চয়ই আছে। দু' নম্বর প্ল্যাটফরম থেকে ট্রেন ছাড়বে। সে নিশ্চয়ই দু' নম্বর প্ল্যাটফরমে ঘোরাঘুরি করছে। তিথিকে দেখতে পেয়ে হাসি মুখে এগিয়ে আসবে। তখন তিথি তার বাবাকে কি বলবে?

দু' নম্বর প্ল্যাটফরমেও মারুফকে দেখা গেল না। তবু তিথির অস্বস্তি দূর হল না। যে কোন মুহূর্তে সে উদয় হতে পারে। জাফর সাহেব যখন মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তখনই শুধু তিথি খানিকটা স্বস্তি বোধ করল। মারুফ এখন এসে উপস্থিত হলে তেমন অসুবিধা হবে না। নুরুজ্জামানকে সামলানো যাবে। সরল ধরনের মানুষ, এদের কে যা বলা হয় তাই তারা বিশ্বাস করে। সে সাড়ে ন'টায় বাসায় ফিরেছে তাকে বলা হয়েছে সিলেট যেতে হবে, সে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ গুছিয়ে প্রস্তুত। একবার জিজ্ঞেসও করে নি — কেন যেতে হবে? ক'দিন থাকতে হবে? হলুদ রঙের একটা কোট তার গায়ে। কোটের বোতামগুলি মেরুন রঙের। কোন সুস্থ মাথার মানুষ এ রকম একটা কোট গায়ে দিতে পারে? সে আবার সুযোগ পেলেই তিথিকে কোট সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছে।

'রাস্তার সাইডে বিক্রি করছিল। হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রেখেছে। একটা দুইটা না শত শত কোট। আমি শুধু শুধু জিজ্ঞেস করলাম — দাম কত? বলল দু'শ টাকা। আমি চলে আসছি, দোকানদার বলল, চলে যাচ্ছেন কেন, একটা দাম বলেন তারপর চলে যান। যদি দরে বনে দিয়ে দিব। না বনলে নাই। আমি বললাম, পঞ্চাশ টাকা। কেনার ইচ্ছা নাই এই জন্য বললাম, পঞ্চাশ। আগে একবার স্যান্ডেল কিনে ঠক খেয়েছিলাম। তাই বুদ্ধি করে এমন কম দাম বললাম। সে সাথে সাথে পলিথিনের

ব্যাগের ভেতর ঢুকায়ে কোট দিয়ে দিল। পরলাম এমন বিপদে না কিনেও পারি না। নিজের মুখে দাম বলেছি। জিনিসটা কেমন হয়েছে?'

'ভাল।'

'ঠিক বলেছেন — ভাল। খুব গরম। গরমের চোটে ঘাম ছুটেছে।'

তিথি অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, গরমের মধ্যে কোট গায়ে দিয়েছেন ঘামতো ছুটবেই।

'এখন গরম তবে সিলেট শীতের জায়গা। তখন দরকার লাগবে। তাছাড়া ট্রেন ছাড়লেও শীত লাগবে।'

তিথির বলতে ইচ্ছা করছে — নুরুজ্জামান সাহেব তাকিয়ে দেখুন একমাত্র আপনিই কোট পরে আছেন।

মারুফ যে শেষ পর্যন্ত আসবে না এটা তিথি ভাবতে পারে নি। ট্রেন ছাড়ার আগ মুর্হূত পর্যন্ত সে আশা করে রইল সে দেখবে মারুফ ছুটতে ছুটতে আসছে। পরনে সুন্দর একটা হাওয়াই সার্ট। মাথার চুল এলোমেলো। সে বোধহয় কখনোই চুল আঁচড়ায় না। বিয়ের পর একটা কাজ তিথি অবশ্যই করবে। মারুফের চুল আঁচড়ে দেবে।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। জানালার কাছে তিথি একা বসে আছে। কামরার দরজাটা খোলা। দরজা বন্ধ করলেই সে একা হয়ে যাবে। তিথি এখনো দরজা বন্ধ করছে না। এখনো সে আশা করে আছে দেখা যাবে হুট করে দরজা দিয়ে মারুফ ঢুকছে। এরকমতো হতেই পারে।

কামরার দরজা তিথি ইচ্ছা করেই খোলা রেখেছে। তার মন বলছে মারুফ ট্রেনে উঠেছে তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। ফার্স্টক্লাস কামরাগুলিতে সে খুঁজবে। দরজা খোলা না রাখলে সে বুঝবে কি করে তিথি এই খানেই আছে।

ট্রেনের এটেনডেন্ট উঁকি দিল। হাতে কম্বল এবং বালিশ। দু'টিই বেশ পরিস্কার। সাধারণত ট্রেনের এটেনডেন্টদের চেহারা এবং আচার আচরণ রুক্ষ্ম ধরনের হয়ে থাকে। এর তেমন না। এর বয়স অল্প। সুন্দর চেহারা। কথা বলছে ভদ্র ও বিনীত ভঙ্গিতে।

'আপা রাতের খাবার খাবেন?'

'না।'

'চা দেই আপা? চা খান। রাত এগারোটার পর চা বন্ধ হয়ে যাবে।'

'দিন। চা দিন।'

'দরজাটা কি বন্ধ করে দেব আপা?'

'না। কিছুক্ষণ খোলা থাক।'

ট্রেনের গতি বাড়ছে। রাতের ট্রেনগুলি কি সব সময়ই দ্রুত চলে? জোছনা আছে। ট্রেনের জানালা থেকে জোছনা মাখা প্রকৃতি দেখার মত আনন্দ আর কিইবা হতে পারে। রাতের ট্রেনে উঠলে তিথির সব সময় মনে হয় — ট্রেনে ট্রেনে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলে মন্দ হত না। তবে একা না। একজন পাশে দরকার। এমন একজন যাকে দেখতে ভাল লাগে। যার পাশে বসতে ভাল লাগে। যার কথা শুনতে ভাল লাগে। এমন একজন যে কথা বলতে বলতে চোখ ফিরিয়ে নিলে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, তুমি চোখ ফিরিয়ে নিলে কেন? খবর্দার আর কখনো এরকম করবে না।

মারুফ কি এমন একজন?

অবশ্যই।

মারুফ নিজে কিন্তু তা জানে না। তিথি তাকে তা জানতে দেয় নি। কাউকে প্রচণ্ডভাবে ভালবাসার মধ্যে এক ধরনের দুর্বলতা আছে। নিজেকে তখন তুচ্ছ এবং সামান্য মনে হয়। এই ব্যাপারটা নিজেকে ছোট করে দেয়। তিথির নিজেকে ছোট করতে ইচ্ছা হয় না।

মারুফের সঙ্গে তার পরিচয় পর্বটা বেশ অদ্ভুত। তিথি এক দুপুরবেলা সায়েন্স লাইব্রেরীর থেকে বের হয়েছে। মাথা না আঁচড়ানো এলোমেলো চুলের এক ছেলে এসে বলল, গত বছর ময়ূখে'র অনুষ্ঠানে আপনার গান আমার অদ্ভুত ভাল লেগেছে। আপনার সঙ্গে আজ এইভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবি নি। যদিও আপনাকে অনেক খুঁজেছি। যাদের প্রাণপণ খোঁজা হয় তাদের কখনো পাওয়া হয় না। ভাগ্যিস আপনাকে পেলাম। আমার নাম মারুফ।

তিথি হকচকিয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে কোনমতে বলল, আপনি মনে হয় ভুল করছেন। আমি গান গাইতে পারি না। কখনো গান গাইনি। ময়ূখে'র অনুষ্ঠান কি তাও জানি না।

'আই এ্যাম সরি।'

'সরি হবার কিছু নেই। মানুষ ভুল করে। আপনিও করেছেন।'

'তা করেছি। তবে আমি সচরাচর ভুল করি না।'

তিথির তখন চট করে মনে হল এই ছেলেটা তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে গল্পটা বানিয়েছে। তার মন খারাপ হল। তিথি এমন কেউ না যে তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে একটা মিথ্যা গল্প তৈরী করতে হবে।

মারুফ তখন দাঁড়িয়ে আছে। তিথি সহজ ভঙ্গিতে বলল, কিছু বলবেন?

মারুফ বলল, একটা কথা বলতে চাচ্ছি। সাহসে কুলুচ্ছে না। আপনি যদি অন্য

কিছু মনে করেন।

'বলুন। আমি কিছু মনে করব না।'

'আপনি ভাবছেন আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে আমি এই গল্পটা বানিয়েছি। এই জন্যেই আমার খারাপ লাগছে। গল্পটা আমি বানাইনি। আমি ঔপন্যাসিক না। গল্প বানাবার ক্ষমতা আমার নেই। বিশ্বাস করুন।'

'আমি বিশ্বাস করলাম।'

তিথি লাইব্রেরী থেকে নেমে এল রাস্তায়। রিকশা নিল। রিকশায় উঠে আরেকবার তাকালো ছেলেটার দিকে। সে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। ধ্বক করে তিথির বুকে ধাক্কা লাগল। তিথি ভেবেই ছিল মারুফ নামের এই ছেলেটি তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। কেন সে তা করল না? এটা এমন কোন বড় ঘটনা না। খুবই সামান্য ঘটনা। কিন্তু এই সামান্য ঘটনার কারণে তিথির সেই রাতে এক ফোটা ঘুম হল না।

শায়লা ফজরের নামাজ পড়বার জন্যে ভোররাতে উঠে দেখেন তিথি অন্ধকারে বসার ঘরের সোফায় চুপচাপ বসে আছে। তিনি বললেন, কি হয়েছে রে তিথি? তিথি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, কিছু হয়নি।

পরের তিন মাস মারুফের সঙ্গে তিথির দেখা হয়নি। যত বার তিথি লাইব্রেরীতে গিয়েছে ততবারই তার মনে হয়েছে আজ লাইব্রেরী থেকে বের হলেই মারুফ নামের ঐ ছেলেটির সঙ্গে দেখা হবে। দেখা হয়নি। প্রতিদিনই চাপা এক ধরণের কষ্ট নিয়ে তিথিকে বাসায় ফিরতে হয়েছে। প্রতিদিনই শায়লা জিজ্ঞেস করেছেন — কি হয়েছে তোর বলতো?

তিথি বলেছে, কিছু হয়নি।

'অবশ্যই হয়েছে। সব আমাকে খুলে বল।'

'খুলে বলার মত কিছু হয়নি মা।'

তারপর একদিন তিথি হাসিমুখে বাসায় ফিরল। দেখা হয়েছে মারুফের সঙ্গে। তিথি লাইব্রেরী থেকে বের হয়েই দেখল মারুফ লাইব্রেরীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছে। বাতাসের জন্যে সিগারেট ধরাতে পারছে না। তিথি একবার ভাবল — কিছু না বলে এগিয়ে যাবে। পরমুহূর্তেই সব সংকোচ সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে এসে বলল, কেমন আছেন?

মারুফ বলল, ভাল।

তিথি বলল, আমাকে চিনতে পারছেনতো?

'পারছি। ময়ূখের অনুষ্ঠানে আপনি গান গিয়েছিলেন। যদিও আপনি তা স্বীকার করেন না। আপনি ত্রিশ সেকেণ্ড আমার জন্যে দাঁড়াবেন — আমার দেয়াশলাইয়ের

কাঠি শেষ হয়ে গেছে আমি সিগারেট টা ধরিয়ে নিয়ে আসি।'

তিথি বলল, এই কাজটা কি আপনি ত্রিশ সেকেণ্ডে করতে পারবেন?

মারুফ বলল, পারব। আপনি ঘড়ি দেখুন আমি ত্রিশ সেকেণ্ডে সিগারেট ধরিয়ে আবার এখানে চলে আসব। আপনার ঘড়িতে সেকেণ্ডের কাঁটা আছেতো?

'আছে।'

'ফাইন। তাকিয়ে থাকুন সেকেণ্ডের কাঁটার দিকে।'

মারুফ ২৭ সেকেণ্ডের মাথায় সিগারেট ধরিয়ে চলে এল এবং হালকা গলায় বলল, ত্রিশ সেকেণ্ড আসলে অনেক দীর্ঘ সময়। আমরা তা বুঝতে পারি না।

বেয়ারা পটে করে চা নিয়ে এসেছে।

'চা ঢেলে দেব আপা?'

'না আমি নিজেই ঢেলে নেব। আমরা এখন কোথায় আছি?'

'টঙ্গী ক্রস করেছি আপা।'

'নেক্সট ষ্টপেজ কোথায়?'

'ভৈরব। আপা দরজা বন্ধ করে দিয়ে যাই?'

'আচ্ছা।'

'ঘুমুবার সময় ভেতর থেকে লক করে দিবেন আপা।'

'আচ্ছা।'

তিথি একা একা চা খাচ্ছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে এখন আর ভাল লাগছে না। পৃথিবীর কোন সুন্দর দৃশ্যই বোধহয় এক নাগারে বেশিক্ষণ দেখা যায় না। সুন্দর যেমন আকর্ষণ করে তেমনি বিকর্ষণও করে।

দরজায় নক হচ্ছে। নুরুজ্জামান এসেছে বোধহয়। তিথি লক্ষ্য করেছে এর মধ্যেই কয়েকবার সে দরজার সামনে দিয়ে হেঁটে গেছে। সে তার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করছে। তিথিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে কঠিণ করে বলতে হবে, আপনি বিরক্ত করবেন নাতো। নিজের জায়গায় গিয়ে ঘুমিয়ে থাকুন। প্রয়োজন হলে আমি আপনাকে ডাকব।

তিথি দরজা খুলল।

মারুফ দাঁড়িয়ে আছে। তার কাঁধে পেটমোটা বিশাল এক কালো ব্যাগ। গায়ে নতুন একটা সার্ট। কি সুন্দর তাকে মানিয়েছে। মারুফ বলল, অবাক হয়েছ?

তিথি জবাব দিল না।

মারুফ বলল, তোমাকে অবাক করে দেবার জন্যে এতক্ষণ উদয় হই নি। ঘাপটি

মেরে ছিলাম।

তিথি এখনও কথা বলছে না। তাকিয়ে আছে। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে চায়ের কাপ থেকে ছলকে খানিকটা চা পড়ে গেছে তার শাড়িতে।

'মনে হচ্ছে অধিক শোকে পাথর হয়ে গেছ? ভেতরে আসতে পারি?'

'হ্যাঁ পার।'

'বসতে পারি?'

'পার।'

'এখন সত্যি করে বল তো, তুমি কি মনে মনে আমাকে এক্সপেক্ট করছিলে না?'

'করিছলাম।'

'আমাকে দেখে খুশি হয়েছ তো?'

'হয়েছি।'

'তোমার মুখে কিন্তু হাসি নেই। হাসিমুখে তাকাও তো। এই তো হাসি এসেছে। গুড গার্ল।'

মারুফ দরজা বন্ধ করে দিল। তিথি ক্ষীণ স্বরে বলল, দরজা খোলা থাক না।

মারুফ বলল, দরজা খোলা থাকবে কেন? একটা কামরায় আমরা দু'জন আলাদা — এই ব্যাপারটায় তুমি কি অস্বস্তি বোধ করছ? আচ্ছা বল, এটা কি অস্বস্তি বোধ করার মত কোন ব্যাপার? তারপরেও তুমি যদি অস্বস্তি বোধ কর তাহলে বরং একটা প্রতিজ্ঞা করি।

'কি প্রতিজ্ঞা?'

'কঠিন প্রতিজ্ঞা। যে প্রতিজ্ঞা ভাঙা অসম্ভব। তোমার হাত ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা। দেখি ডান হাতটা বাড়াও।'

তিথি হাত বাড়াল। মারুফ হাত ধরে, চোখ বন্ধ করে বিড় বিড় করে বলল,

"পৃথিবী নামক গ্রহটির সবচে রূপবতী তরুণীর হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করছি — এই কামরায় আমি যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ আমি এই রূপবতীর কাছ থেকে খুব কম করে হলেও এক হাত দূরত্ব বজায় রাখব।"

তিথি বলল, নাটক করার দরকার নেই। তুমি বস তো আরাম করে।

'তাহলে আমি কি ধরে নিতে পারি যে, এই কামরায় রাত কাটানোর অনুমতি পেয়েছি?'

'চা খাবে? পটে চা আছে।'

'দাও।'

'চায়ে চুমুক দিতে দিতে মারুফ বলল, হলুদ কোট পরা একজনকে দেখলাম তোমার মালপত্র টানাটানি করছে — সে কে?'

'নুরুজ্জামান।'

'ও আচ্ছা — আমাদের পাতার বাঁশিবাদক। তোমার চড়নদার?'

'হুঁ।'

'যে কোট গায়ে দিয়ে সে ঘুরছে সেটা যে মেয়েদের কোট তা তুমি ওকে বলতে পারলে না?'

'বেচারা শখ করে কিনেছে। কি দরকার কথা বলার?'

মারুফ বলল, তোমার সঙ্গে কি কোন খাবার আছে তিথি? আমি তাড়াহুড়া করতে গিয়ে খেয়ে আসি নি।

'আমার সঙ্গে কোন খাবার নেই। তবে এদের বুফে কারে নিশ্চয়ই খাবার আছে।'

'নেই, খোঁজ নিয়েছি। বোম্বাই টোস্ট নামে কি একটা ভেজে রেখেছে। ওর থেকে ১০১ গজ দূরে থাকা ভাল।'

'সারারাত না খেয়ে থাকবে?'

'হ্যাঁ থাকব। সিগারেট ধরাব, তোমার অসুবিধা হবে না তো?'

'ক্রমাগত সিগারেট খেতে থাকলে অসুবিধা হবে। একটা-দু'টা খেলে অসুবিধা হবে না।'

একটা মানুষ সারা রাত না খেয়ে থাকবে? তিথির খুব খারাপ লাগছে। কোন স্টেশনে থামলে কলাটলা জাতীয় কিছু কিনতে হবে। নেক্সট স্টপেজ কোথায় — ভৈরব? ভৈরবে থামবে তো? আন্ত নগর ট্রেনগুলি এমন হয়েছে কোথাও থামে না। ট্রেন স্টেশনে না থামলে ভাল লাগে না। স্টেশনে ট্রেন থামবে, চা গ্রাম চা গ্রাম শব্দ হবে। লোকজন উঠবে নামবে। তবেই না মজা।

তিথি বলল, ভৈরবে ট্রেন থামলে তুমি স্টেশনে নেমে কিছু খেয়ে নেবে।

'আমার খাওয়া নিয়ে তুমি মোটেই চিন্তা করবে না। না খেয়ে থাকা আমার অভ্যাস আছে।'

মারুফ না খেয়ে আছে এটা সত্যি না। সে খাওয়া-দাওয়া করেই ট্রেনে উঠেছে। না খাওয়ার কথা বলেছে, কারণ ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতি মেয়েদের এক ধরনের বিশেষ মমতা আছে। মমতা তৈরীর এই সুযোগ নষ্ট করা ঠিক হবে না।

'তোমার বাবা কেমন আছেন?'

'ভাল।'

'এখনো হাসপাতালে?'

'মনে হয়।'

'মনে হয় বলছ কেন?'

আমার এক মামা আছেন, তাঁকে বলে এসেছি বাবাকে হাসপাতাল থেকে

রিলিজ করিয়ে বাসায় এনে রাখতে। তবে বাবা বোধহয় রাজি হবেন না। তিনি কোন কিছুতেই রাজি হন না।

বন্ধ দরজায় টোকা পড়ছে। মারুফ বিরক্ত মুখে দরজা খুলে দিল। নুরুজ্জামান দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে রাজ্যের বিস্ময়। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মারুফের দিকে। মারুফ বলল, আপনি কি চান?

নুরুজ্জামান বলল, আপনি কে? আপনি এখানে কেন? এটা রিজার্ভ কামরা। উনি একা যাবেন।

তিথি খুবই অস্বস্তির সঙ্গে বলল, নুরুজ্জামান সাহেব, কোন অসুবিধা নেই।

নুরুজ্জামান কঠিন গলায় বলল, অসুবিধা নেই বললে তো হবে না। অবশ্যই অসুবিধা আছে। এই যে ভাই শুনুন। বের হয়ে আসুন।

নুরুজ্জামান কথা বলছে উঁচু গলায়। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এখনই সে সার্টের কলার ধরে মারুফকে বের করে আনবে।

মারুফ বিরক্ত গলায় বলল, আপনি বরং ভেতরে এসে বসে একটু শান্ত হোন। যে হৈ-চৈ শুরু করেছেন ট্রেনের সব যাত্রী চলে আসবে। তিথি, আমার ব্যাপারটা তুমি এই ভদ্রলোককে বুঝিয়ে বল তো। যন্ত্রণা হল দেখি!

তিথি বলল, নুরুজ্জামান সাহেব, ভেতরে আসুন।

নুরুজ্জামান ভেতরে ঢুকল।

'দরজা বন্ধ করে দিয়ে বসুন।'

'আমি বসব না। কি বলবেন বলুন।'

'বসুন তো।'

নুরুজ্জামান বসল না। দাঁড়িয়েই থাকল। তিথি বলল, উনি আমার পরিচিত একজন। তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তিনি এক কাপ চা খাবার জন্যে ঘরে এসেছেন। আপনি যা হৈ-চৈ শুরু করেছেন — খুবই অস্বস্তির মধ্যে আমাদের ফেলেছেন।

নুরুজ্জামান লজ্জিত গলায় বলল, আসলে আমার মাথায় হঠাৎ রক্ত উঠে গেছে। এটেনডেন্টকে জিজ্ঞেস করেছি আপনি চা-টা খেয়েছেন কি-না। সে তখন বলল, এই ঘরে একজন ভদ্রলোক আছেন। তখন . . .

তিথি শান্ত গলায় বলল, বুঝতে পারছি। আপনি শুধু-শুধুই আপসেট হয়েছেন। একজন অচেনা লোক তো আর হুট করে আমার ঘরে ঢুকে যেতে পারবে না। আমি তা দেব কেন?

মারুফ বলল, তিথি, তুমি সত্যি কথাটা ভদ্রলোককে বল। ও চলে যাক।

নুরুজ্জামান বলল, সত্যি কথাটা কি?

মারুফ আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, সত্যি কথাটা হচ্ছে — তিথি আমার স্ত্রী। আমরা গোপনে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছি। দু' সীটের এই স্লিপিং বার্থ নেয়া হয়েছে যাতে আমরা নিরিবিলি যেতে পারি। আশা করি ব্যাপারটা এখন বুঝতে পেরেছেন? না-কি আপনাকে বিয়ের কাবিন নামা দেখাতে হবে?

নুরুজ্জামান ভয়ংকর অবাক হয়ে তিথির দিকে তাকালো। তিথির দারুণ লজ্জা লাগছে। মারুফ এসব কি বলছে? তিথি অস্বস্তি ঢাকার জন্যে অকারণেই নিজের ব্যাগ খুলল।

মারুফ বলল, তিথি, আমি যে সত্যি কথা বলছি এটা এই ভদ্রলোককে বলে দাও — ও বিদেয় হোক।

তিথি বলল, নুরুজ্জামান সাহেব — আমাদের বিয়ে এখনো হয়নি। তবে এক সপ্তাহের ভেতরই হবে।

'ও আচ্ছা।'

মারুফ বলল, ও আচ্ছা না। আপনি দয়া করে নিজের জায়গায় যান। আপনার হলুদ কোট দেখে মাথা ঘুরছে। এই কোট পেয়েছেন কোথায়?

'কিনেছি?'

'এটা যে মেয়েদের কোট তা জানেন?'

'জ্বি না, জানতাম না।'

'এখন তো জানলেন। এখন দয়া করে কোটটা গা থেকে খুলে ফেলুন। এবং বিদেয় হোন।'

নুরুজ্জামান নড়ল না। বরং তিথি এবং মারুফ দু'জনকেই অবাক করে দিয়ে বসল। মারুফ বলল, বসলেন যে! ব্যাপার কি? নুরুজ্জামান জবাব দিল না।

জাফর সাহেব তার উপর দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন। তিথিকে দেখে-শুনে নিয়ে যেতে। সে যে ভাবেই হোক তা করবে। এদের বিয়ে যখন হবে, তখন হবে। এখনও তো বিয়ে হয় নি।

মারুফ বলল, মনে হচ্ছে আপনি যাবেন না?

নুরুজ্জামান বলল, জ্বি, অবশ্যই যাব। এখানে বসে থাকব কেন?

'এই তো বসে আছেন।'

'আপনার জন্যে বসে আছি।'

'আমার জন্যে বসে আছেন মানে?'

'আপনি যখন যাবেন তখন আমিও যাব।'

মারুফ তিথির দিকে তাকালো। তিথি কিছুই বলল না। মারুফ নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে হাসিমুখে বলল, আচ্ছা আচ্ছা, বসুন। তিনজন মিলেই গল্প করা

যাক। আসলে গল্প-গুজব তিনজন ছাড়া জমে না। থ্রি ইজ কোমপেনি। আপনি করেন কি?

'আমি একজন শিক্ষক।'

'তিথি বলছিল আপনি একজন বংশিবাদক। পাতার বাঁশি বাজান।'

'জ্বি বাজাই।'

'ভাল। বাজান পাতার বাঁশি। শুনে দেখি। আর যখন কিছুই করার নেই তখন পাতার বাঁশিই শোনা যাক।'

'পাতা সাথে নাই।'

'বাঁশি বাজান অথচ সাথে পাতা নেই এটা কেমন কথা? এরপর থেকে সঙ্গে পাতা রাখবেন। কোন স্টেশনে যদি ট্রেন থামে তাহলে দৌড়ে নেমে পাতা নিয়ে আসবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তিথি, তুমি চুপ করে আছ কেন? কিছু বল।'

'আমার মাথা ধরেছে।'

'একটু কষ্ট কর। কোন এক স্টেশনে ট্রেন থামুক — তখন উনি পাতা নিয়ে আসবেন। সেই পত্রসংগীত শুনে হোপফুলি তোমার মাথাধরা সেরে যাবে। নাম কি যেন আপনার?'

'নুরুজ্জামান।'

'লোকজন আপনাকে কি ডাকে? নুরু?'

'জ্বি।'

'আমি আপনাকে নুরু ডাকলে আপনার আপত্তি আছে?'

'জ্বি-না।'

'নুরু!'

'জ্বি।'

'ভালবাসা সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত কি?'

'কি বললেন বুঝতে পারলাম না।'

'মনে করুন, আপনার স্কুলের ছাত্রদের আপনি 'ভালবাসা' কি এর উপর একটা বক্তৃতা দিচ্ছেন। এদের কি বলবেন?'

'ইস্কুলে তো এইসব বিষয়ে বক্তৃতা দেয়া হয় না।'

'মনে করুন, নতুন কারিকুলাম তৈরি হয়েছে। এই কারিকুলামে 'ভালবাসা'র উপর বক্তৃতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তখন কি করবেন? কারিকুলাম শব্দটার মানে জানেন তো?'

'জানি।'

তিথি বলল, তুমি কি সব কথা বলছ? দয়া করে চুপ কর।

'চুপচাপ বসে থেকেই বা কি হবে? তারচে বরং আমরা নুরুর কাছ থেকে 'ভালবাসা' কি এটা জেনে নেই। আমার মনে হচ্ছে উনার বক্তৃতা ইন্টারেস্টিং হবে। নুরু, বলুন 'ভালাবাসা' কি?'

নুরুজ্জামান বলল, ঘৃণার উল্টোটাই হল ভালবাসা। আমাকে এইখানে বসে থাকতে দেখে আপনার মনে যে ভাব তৈরি হয়েছে এটার উল্টোটাই ভালবাসা।

মারুফ একটু থমকে গেল। হলুদ কোট গায়ে এই গ্রাম্য মানুষটার মুখ থেকে এ ধরনের কথা আশা করা যায় না। তবে গ্রামের লোক মাঝে-মাঝে চমকে যাওয়ার মত কথা বলে। সেই সব কথাও সাময়িক। আলো পড়লে এক খণ্ড লোহাও মাঝে-মধ্যে ঝলসে উঠে। হীরক খণ্ডের সার্বক্ষণিক দ্যুতি লোহার মধ্যে নেই।

'নুরু!'

'জ্বি।'

'ভালবাসার ব্যাখ্যা তো আপনি উল্টো দিক থেকে করলেন। সরাসরি ব্যাখ্যা করুন তো।'

'ময়মনসিংহ গীতিকায় ভালবাসা কি তা সুন্দর করে বলা আছে। সেটা বলব?'

'বলুন।'

'উইড়া যায়রে বনের পঙ্খী পইরা থাকে মায়া।'

'এখানে ভালবাসা কোনটা — বনের পাখিটা? যে উড়ে চলে গেল?'

'জ্বী না। বনের পাখি ভালবাসা না। ভালবাসা হল মায়া। পাখি উড়ে গেলেও যেটা থাকে, সেটা।'

ট্রেন ভৈরব স্টেশনে থেমেছে। তিথি মারুফের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল, তুমি খাবারের ব্যবস্থা কর।

মারুফ বলল, দরকার নেই।

'দরকার নেই বললে তো হবে না। তুমি সারারাত না খেয়ে থাকবে না-কি?'

'আমার খিদে নষ্ট হয়ে গেছে।'

'মোটেই তোমার খিদে নষ্ট হয় নি। মুখ দেখেই মনে হচ্ছে তুমি কষ্ট পাচ্ছ।

'খাদ্যের অভাবে আমি কষ্ট পাই না তিথি। আমি কষ্ট পাই ভালবাসার অভাবে।'

কথার পিঠে এই চমৎকার বাক্যটি ব্যবহার করতে পেরে মারুফের ভাল লাগছে। সব সময় এ রকম বাক্য মাথায় আসে না। হঠাৎ হঠাৎ আসে।

নুরুজ্জামান উঠে দাঁড়াল। মারুফ বলল, চলে যাচ্ছেন না-কি? দয়া করে চলে যাবেন না। আপনি চলে গেলে আমরা এতিম হয়ে পড়ব।

নুরুজ্জামান বলল, আমি আপনার জন্যে খাবার নিয়ে আসি। কি খাবেন বলুন?

'বিষ পাওয়া যায় কি–না দেখুন। র‍্যাটম হলে সবচে ভাল হয়।'

নুরুজ্জামান নেমে গেল। তিথি বলল, তুমি এই লোকটাকে নিয়ে রসিকতা করছিলে। আমার ভাল লাগছিল না।

'আমারও ভাল লাগছিল না। কি করব বল — রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে। রসিকতা করে রাগটা একটু কমালাম। তবে লোকটা নির্বোধ না। ভালবাসার ব্যাখ্যা ভালই দিয়েছে। এখন বল তো তিথি, এই ব্যাটার হাত থেকে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায়?'

'জানি না।'

'একটা বুদ্ধি বের কর।'

তিথি চুপ করে থাকল। আসলেই তার মাথা ধরে গেছে। কপাল দপদপ করছে। জ্বর আসছে কি–না কে জানে, শীত শীত লাগছে। মারুফ বলল, একটা কাজ যদি কর তাহলে কিন্তু এই গাধা বিদেয় হবে।

'কি কাজ?'

তুমি যদি তাকে কঠিন করে বল — আপনি আমাদের যথেষ্ট বিরক্ত করেছেন – – এখন চলে যান। আমরা এখন দরজা বন্ধ করে গল্প করব। পারবে বলতে?

'না।'

'তোমাকে বলতেই হবে। না বললে হবে কি ভাবে? এমন সুন্দর একটা রাত আমরা নষ্ট করব? তাকিয়ে দেখ কি সুন্দর জোছনা।'

তিথি চুপ করে আছে। মারুফ বলল, এই লোক কি করবে জান? এ আমার জন্যে খাবার আনবে, সেই সঙ্গে পাতা নিয়ে আসবে বাঁশি বাজানোর জন্যে। পাতার বাঁশি বাজিয়ে সে তোমাকে মুগ্ধ করতে চাইবে।

'কেন?'

'আমার তাই মনে হচ্ছে। এবং আমার ধারণা বাঁশি ভালই বাজাবে। তুমি মুগ্ধ হয়েও যেতে পার।'

'পাগল হলে না–কি?'

'বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি। এই লোক আর কিছুক্ষণ থাকলে আমি সত্যি পাগল হয়ে যাব। শোন তিথি — তুমি এই লোককে যদি চলে যেতে না বল তাহলে আমি নিজে চলে যাব। তিনজন এই কামরায় বসে থাকার কোন অর্থ হয় না।'

নুরুজ্জামান খাবার নিয়ে এসেছে। লুচি, মিষ্টি, কলা। মারুফ বলল, পাতা কোথায়?

'কিসের পাতা?'

'পাতা ছাড়া বাঁশি বাজাবেন কি ভাবে? পাতা আনেন নি?'

'জ্বি না।'

'ও মাই গড ! কৃষ্ণের বাঁশি ছাড়া আমরা এই দীর্ঘ রজনী পার করব কি ভাবে?'

নুরুজ্জামান তাকিয়ে আছে। তার চোখের তারায় চাপা রাগ ঝিলিক দিচ্ছে। সে খাবার নামিয়ে রাখছে। মারুফ বলল, তিথি বোধহয় আপনাকে কিছু বলবে, শুনুন তো। মন দিয়ে শুনবেন। তিথি, তুমি কি জানি বলতে চাচ্ছিলে, বলে ফেল।

তিথি বলল, নুরুজ্জামান, আপনি এখন চলে যান। ভোরবেলা ট্রেন যখন থামবে তখন আসবেন।

নুরুজ্জামান খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, জ্বি আচ্ছা।

নুরুজ্জামান বাইরে এসে দাঁড়াতেই মারুফ ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। মারুফ বলল, তিথি শোন, তুমি আপসেট হয়ো না। আমি কিছুক্ষণের জন্যে বাতিটা নিভিয়ে দিচ্ছি। বাতি নিভিয়ে আমি ঐ লোককে একটা ম্যাসেজ দিতে চাই। তা ছাড়া বাতি না নেভালে সুন্দর চাঁদের আলো আমরা পাব না।

তিথি কিছু বলার আগেই মারুফ বাতি নিভিয়ে দিল।

নুরুজ্জামান মিনিট পাঁচেক বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত পায়ে চলে গেল।

শায়লা অবাক হয়ে বললেন, তুই কোত্থেকে?

তিথি বলল, তোমাকে নিতে এসেছি মা। স্যুটকেস গুছিয়ে নাও। আজ দুপুরে একটা ট্রেন আছে ঢাকা যাবে।

'তুই হড়বড় করিস না তো। তোর সাথে এটা কে?'

'ইনার নাম নুরুজ্জামান। ইনি পাতার বাঁশি বাজান। ইনি আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এসেছেন।'

'তোর হড়বড়ে কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'মাথা আরো গুলিয়ে যাবে যখন আসল কথা শুনবে।'

'আসল কথা কি?'

'আসল কথা হল আমার বিয়ে। বিয়ের তারিখ তোমার অনুপস্থিতিতেই মোটামুটি ঠিক করা হয়েছে — আসছে বৃহস্পতিবার। যার সঙ্গে বিয়ে তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। সে সরাসরি তোমার সামনে আসতে ভরসা পাচ্ছে না বলে বেবীটেক্সিতে বসে আছে। তুমি যদি ভরসা দাও তাহলে তাকে নিয়ে আসতে পারি। মা আনব?'

শায়লা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মাথা সত্যি সত্যি এলোমেলো হয়ে গেছে। তিনি তাঁর নিজের মেয়েকে এত হাসিখুশি কখনো দেখেন নি। হীরক খণ্ডে আলো পড়লে হীরক খণ্ড যেমন ঝলমল করতে থাকে — তিথিও তেমনি ঝলমল করছে। শায়লার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করছে — তুই হঠাৎ এত সুন্দর হয়ে গেলি কি ভাবে? কিন্তু তিনি কিছু বলতে পারছেন না। তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

তিথি বলল, মা, তুমি যেহেতু হ্যাঁ না কিছুই বলছ না তখন ধরে নিচ্ছি তোমার সম্মতি আছে। নুরুজ্জামান সাহেব, আপনি দয়া করে মারুফকে ডেকে আনুন।

শায়লা দেখলেন, নীল রঙের হাওয়াই শার্ট পরা টকটকে ফর্সা একটা ছেলে হাসি মুখে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এত সুন্দর একটা ছেলে কিন্তু চুল আঁচড়ায়নি কেন?

তিথি বলল, মা, ওর নাম মারুফ। এখন তুমি ইচ্ছা করলে একটা বটি দিয়ে আমাদের দু'জনকে কেটে চার টুকরা করে ফেলতে পার, কিংবা আদর করে পাশাপাশি দাঁড়া করাতে পার। কোনটা করবে তুমি ঠিক কর।

মারুফ সালাম করবার জন্যে নিচু হয়েছে। শায়লা কিছুক্ষণের জন্যে পাথরের মূর্তির মত শক্ত হয়ে রইলেন। তারপরই মারুফের মাথায় হাত রাখলেন। তাঁর আরেকবার মনে হল — তিথি কেন লক্ষ্য করে না যে এর চুল আঁচড়ানো নেই।

শায়লা তাকালেন তিথির দিকে। মা'র হাসি দেখে তিথির চোখ ভিজে উঠছে। তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করছে — আমার মা এত ভাল কেন?

আগামী বৃহস্পতিবার তিথির বিয়ে।

মারুফ চাচ্ছিল উৎসব টুৎসব কিছু হবে না। উৎসবের কোন দরকার নেই অর্থহীন সামাজিকতা। জাফর সাহেব রাজি হন নি। তাঁর প্রথম মেয়ের বিয়ে । তিনি কম্যুনিটি সেন্টারে বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। বিয়ের কার্ড ছাপা হয়েছে একদিনে। কার্ডে তিথির নাম ভুল ছাপা হয়েছে তিথির জায়গায় তিতি। এ নিয়ে শায়লার সঙ্গে তাঁর একটা খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধ শায়লা একাই করলেন, জাফর সাহেব যুদ্ধ শুরুর আগেই পরাজয় স্বীকার করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'নামের বানানেই ভুল। আসল জায়গাতেই গন্ডগোল — এটা তোমার চোখে পড়ল না। এতগুলো টাকা খরচ করলে একটা ভুল কাজে?'

'ঠিক করে দেব।'

'কি ভাবে ঠিক করবে?'

'নুরুজ্জামান ঠিক করে দেবে বলেছে।'

'সে কি ভাবে ঠিক করবে?'

'জানি না। বলেছেতো ঠিক করে দেবে।'

তিথির আনন্দ লাগছে এই কারণে যে বাবা–মা'র ঝগড়া নেই। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছে না কোন কালে তাদের কোন সমস্যা ছিল। তিথি মা'কে নিয়ে বাসায় ফিরে দেখে বাসা খালি। জাফর সাহেব খাবার টেবিলের উপর চিঠি রেখে গেছেন। চিঠিতে লেখা—

"শায়লা,

তুমি যেহেতু চাচ্ছ না আমি এ বাড়িতে থাকি সেহেতু চলে গেলাম। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে প্রয়োজন মনে করলে আসব। আমার ঠিকানা হল – ৩১ কলতা বাজার।"

শায়লা তৎক্ষণাৎ স্বামীর খোঁজে গেলেন। তিথি সঙ্গে যেতে চাচ্ছিল, তাকে

নিলেন না। ঠিকানা খুঁজে পেতে সমস্যা হতে পারে ভেবে নুরুজ্জামানকে সঙ্গে নিলেন। এবং ঘন্টা খানিকের মধ্যে জাফর সাহেবকে নিয়ে ফিরে এলেন। তিথি তার ২৩ বছরের জীবনে বাবাকে এত আনন্দিত দেখেনি। মা অবশ্যি ক্রমাগত বাবাকে ধমকে যাচ্ছেন। কিন্তু জাফর সাহেব কিছুই গায়ে মাখছেন না। বরং তাঁর ভাব দেখে মনে হচ্ছে স্ত্রীর বকা খেতে তার খুব ভাল লাগছে।

সবচে বড় পরিবর্তন যা হয়েছে তা হল এ বাড়িতে নুরুজ্জামানের অবস্থান। শায়লা শুরু থেকেই তাকে এ বাড়ির একজন সদস্য হিসেবে নিয়েছেন। সেও ক্রমাগত বকা খাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগেই তিথি শুনল মা নুরুজ্জামানকে বকছেন— বুঝলে নুরুজ্জামান, এই পৃথিবীতে তোমার মত এবং তিথির বাবার মত অপদার্থ আমি এখনো দেখিনি। তোমরা দু'জনই একপদের। তোমাকে আমি কি বলেছিলাম? রেন্ট এ কার থেকে সারাদিনের জন্যে একটা গাড়ি ভাড়া করতে বলেছিলাম। দাওয়াতের চিঠি বিলি করতে হবে। গাড়ি ভাড়া করেছ?

'জ্বি না।'

'কেন করনি জানতে পারি?'

'দাওয়াতের চিঠিতে বানান ভুল। এইগুলা ঠিক করে তারপর যাব।'

'সেই ঠিকতো তুমি সকাল থেকে করছ। কতক্ষণে শেষ হবে? হাসছ কেন? যখন তখন বোকার মত দাঁত বের করে হাসবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আমার সামনে থেকে যাও তো। গরমের মধ্যে এই হলুদ কোটটা গায়ে দিয়ে আছ কেন? এটা গা থেকে খোল। আর কোন দিন যেন এই যন্ত্রণা গায়ে না দেখি।'

'জ্বি আচ্ছা।'

নুরুজ্জামান গভীর মনোযোগে বানান ভুল ঠিক করছে। তাকে সাহায্য করছে মীরা এবং ইরা। প্রথমে হোয়াইট ইংক দিয়ে একটা 'ত' মুছে ফেলা হচ্ছে। মীরা ও ইরার দায়িত্ব হচ্ছে ফু দিয়ে দিয়ে কালি শুকানো। কালি শুকানোর পর 'ত' টাকে চায়নিজ ইংক দিয়ে 'থ' করা হচ্ছে। এই কাজটি করছে নুরুজ্জামান। কাজটা খুব সাবধানে করতে হচ্ছে। যেন ছাপার অক্ষরের মত দেখা যায়। কালি লেপটে না যায়।

ইরা বলল, নুরুজ্জামান ভাই আপনি না থাকলে আমাদের কি যে সমস্যা হত। আপনি থাকায় মা'র রাগটা দু'ভাগ হয়ে বাবার এবং আপনার উপর পড়ছে। আপনি না থাকলে অর্ধেকটা রাগ আমার আর মীরার উপর পড়তো। বড় আপার উপরতো মা এখন রাগ করতে পারবে না। তার বিয়ে হচ্ছে। ঠিক বলছিনা নুরুজ্জামান ভাই?

নুরুজ্জামান বলল, কথা বলবে না কাজ কর।

জাফর সাহেব তিথির পাসপোর্ট নিয়ে এসেছেন। এখন ভিসার ব্যাপারটা ঠিক করতে পারলে তিথিকে মারুফের সঙ্গেই পাঠিয়ে দেয়া যায়। হাতে বেশ কিছু ডলার দিয়ে দিতে হবে। যাতে বিদেশের মাটিতে পা দিয়েই বিব্রত হতে না হয়। জাফর সাহেব প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ডলার করার জন্যেই এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা তুলেছেন। এতে প্রায় তিন হাজার ডলার হবে। এত ডলার কি ভাবে সঙ্গে দেয়া যায় সেও সমস্যা। মারুফের সঙ্গে ব্যাপারটা আলাপ করা দরকার। তাকে পাচ্ছেনও না। সেও বোধহয় ছুটোছুটির মধ্যে আছে।

মারুফের বাবার সঙ্গে তাঁর এখনো কথা হয়নি। অথচ কথা বলা খুব দরকার। শুধু যে মারুফের বাবার সঙ্গেই কথা হয়নি তা না, তার আত্মীয় স্বজন কারোর সঙ্গেই কথা হয়নি।

গতকাল মারুফের দূর সম্পর্কের এক চাচা-চাচী এসেছিলেন দু'জনই বেশি কথা বলেন। স্ত্রী কোন কথা বলতে গেলে স্বামী তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কথা শুরু করেন। আবার স্বামী কিছু বলতে গেলে স্ত্রী আগ বাড়িয়ে তা বলে ফেলেন। তাদের সঙ্গে কাজের কথা কিছুই হয়নি। অথচ অনেক কিছু বলার আছে। মারুফের সঙ্গে সিটিং হওয়া দরকার। তাকে পাওয়াই যাচ্ছে না। নুরুজ্জামানকে দিয়ে তার ঘরে চিঠি লিখে ফেলে রাখা হয়েছে। চিঠিতে অবিলম্বে বাসায় এসে দেখা করতে বলা হয়েছে। তাতেও লাভ হচ্ছে না। সে আসছে না।

জাফর সাহেব ভেবে রেখেছেন গভীর রাতে নুরুজ্জামানকে নিয়ে একবার যাবেন। নুরুজ্জামানকেও পাওয়া যাচ্ছে না। সে চরকির মত ঘুরছে। একটা বিয়ে বাড়ির কাজতো অল্প না। হাজারো কাজ । মজার ব্যাপার হল জাফর সাহেব তেমন কোন কাজ পাচ্ছেন না। তিনি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ঘরে বসে আছেন। অথচ করার কিছু নেই। কম্যুনিটি সেন্টার ভাড়ার ব্যাপারটা নিজে করতে চেয়েছিলেন, শায়লা ধমক দিয়েছেন তুমি চুপ করে থাকতো। এসবের তুমি কি বোঝ?

বিয়ের ব্যাপারটা তিথির বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনরা এখনো কেউ জানেনা। তিথি কাউকেই জানায়নি। মারুফের বিশেষ অনুরোধ ছিল যেন জানানো না হয়। মারুফের এ ব্যাপারটাও তিথি বুঝতে পারছে না। কেন কাউকে জানানো হবে না। বিয়ে নিশ্চয়ই কোন সামাজিক অপরাধ না যে কাউকে বলা যাবে না চুপি চুপি সারতে হবে। মারুফের যুক্তি হচ্ছে, বিয়ে শুধু মাত্র দু'জনের ব্যাপার। এই দু'জনের বাইরে কারোর কিছু নয়। কাজেই ঢাক ঢোল পিটানো কেন? তা ছাড়া সে এই বিয়েতে কিছু দিতে পারছে না। লোকজন এসে দেখবে ফকিরি বিয়ে। কি দরকার?

মারুফের কোন যুক্তিই তার কাছে গ্রহণ যোগ্য মনে হয়নি। তিথির মনে হয়েছে মারুফ নানান সমস্যায় বিব্রত। সমস্যাগুলি কি তাও পরিস্কার করে বলছে না।

বললে সমস্যার সমাধান না দিতে পারলেও মানসিক ভরসা সে দিতে পারত। মারুফ বোধ হয় তা চায় না। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা নিজের সমস্যা নিজের মধ্যেই রাখতে চায়। অন্যকে সমস্যায় জড়াতে চায় না। মারুফ কি তাদের একজন? তিথি এখনো পুরোপুরি জানে না।

সেদিন মারুফের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সে বেশ কষ্ট পেয়েছে। নিজের জন্যে কষ্ট না মারুফের জন্যে কষ্ট। মারুফকে মনে হচ্ছে মহাচিন্তিত। মুখ টুখ শুকিয়ে কি হয়েছে। চোখের নিচে কালি। তিথি বলল, কি হয়েছে তোমার ? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

'আমার পেটে গ্যাস হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে তুমি খুব চিন্তিত।'

'পেটে গ্যাস হলে চিন্তিত হব না? পেটের গ্যাস থেকে কত কি যে হতে পারে তা তুমি জান?'

'এ ছাড়া অন্য কোন সমস্যা নেই।'

'আছে সামান্য সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধান তুমি করতে পারবে না।'

'সমাধান না করতে পারি সমস্যা শুনতে তো বাধা নেই।'

'মিনিষ্ট্রি অব এডুকেশন ঘাপলা করছে। ভয়ে ভয়ে আছি হয়ত দেখা যাবে শেষ মুহূর্তে একটা ফ্যাকড়া তুলবে। নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দিল না। প্লেনে উঠতে পারলাম না।'

'এরকম সম্ভাবনা কি আছে?'

'না নেই। তবে এদেশে সবই সম্ভব। এরকমও হয়েছে যে স্কলারশীপ পেয়েছে একজন, চলে গেছে অন্যজন। এর নাম হল বঙ্গদেশ — সেলুকাস কি বিচিত্র এ দেশ।'

তিথি বলল, এ রকম সম্ভাবনা থাকলে আমি বাবাকে বলি। বড় মামাকে বলি। তারা একটু খোঁজ খবর করুক। বড় মামা অনেক গুরুত্বপূর্ণ লোকজনদের চেনেন।

মারুফ বিরক্ত স্বরে বলল, অনেক গুরুত্বপূর্ণ লোকজনকে আমিও চিনি। বাংলাদেশ খুব ছোট্ট জায়গা। এই জায়গায় সবাই সবাইকে চেনে। খোদ যে এডুকেশন মিনিষ্টার তাঁকে আমি নিজে চিনি না কিন্তু আমার বাবা চেনেন। তিনি আমার বাবার ছাত্র ছিলেন। আমি যতদূর জানি তাঁর পড়াশোনার মূল খরচ আমার বাবা চালিয়েছেন।

'তাহলে তোমার সমস্যা কি?'

'আছে সমস্যা আছে। আমি পুরানো প্রসঙ্গ টেনে সুবিধা কেন নেব? ধর কোন কারণে যদি মিনিষ্ট্রি অব এডুকেশন আমার স্কলারশীপ বাতিলও করে দেয় আমিতো

তা নিয়ে মন্ত্রীকে বলতে যাব না। নিজের জন্যেতো কখনোই না। অন্যের জন্যে যাওয়া যায়, নিজের জন্যে যাওয়া যায় না।'

তিথি বলল, তুমি তাহলে আমাদের নুরুজ্জামান সাহেবের একটা কাজ যদি পার করে দিও। বেচারা ঢাকায় এসেছেই শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। প্রথম প্রথম বাবাকে অনুরোধ করেছে। এখন আর করে না। বুঝে ফেলেছে বাবাকে বলে কিছু হবে না।

'ঐ ব্যাটা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে কি করবে?'

'মেয়েদের একটা স্কুল দেবে।'

'এইসব ফালতু ব্যাপার নিয়ে আমাকে চিন্তা করতে বলবে নাতো। আমার হয়েছে — মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা।'

'তবু তোমার সামান্য পরিশ্রমে যদি অন্য একজনের উপকার হয়।'

'দেখি।'

'দেখ আর না দেখ। মরার মত বিছানায় শুয়ে থাকবে না। উঠে বসতো। আজ আবার দাড়ি কামাওনি ব্যাপার কি?'

'ব্রণ।'

'তুমি এক কাজ কর দাড়ি রেখে ফেল। দাড়িতে তোমাকে খারাপ দেখায় না। হি হি হি।'

'হাসবে না তিথি। কারোর হাসিই আমার এখন সহ্য হয় না।'

'আচ্ছা যাও হাসব না। এসো দু'জনে মিলে কাঁদি।'

মারুফ হাসল। তিথি বলল, আমার পাসপোর্ট হয়ে গেছে। বাবা ২৪ ঘন্টায় পাসপোর্ট বের করেছেন, তিন হাজার টাকা ঘুস দিয়ে। চিন্তা কর — বাবার মত সৎ মানুষ ঘুস দিচ্ছে।

মারুফ হাই তুলতে তুলতে বলল, সৎ মানুষরাই বেশি ঘুস দেয়। ঘুস ব্যাপারটা টিকে আছে সৎ মানুষদের কল্যাণে।

'তুমি কি যে সিনিকেল কথা বল।'

'গভীর দুঃখ ও বেদনা থেকে বলি বুঝলে? এই যে তুমি পাসপোর্ট টাসপোর্ট করে বসে আছ — তোমার যাওয়াতো দূরের কথা দেখা যাবে আমি নিজেই যেতে পারছি না।'

'না যেতে পারলে নেই। বিদেশ এমন কোন বড় ব্যাপার না। তুমি এমন গুমি ভাব ধরে বসে থাকবে না। বল আমি কি করলে তোমার মনটা ভাল হবে।'

'চুমু খেয়ে দেখতে পার।'

তিথি লজ্জিত গলায় বলল, ছিঃ নির্বিকার ভাবে কি করে এরকম কথা বল।

মারুফ বলল, বাইরে কাউকে বলি না। আমি আমার স্ত্রীকে বলি। শুনুন মাই ডিয়ারেস্ট — আমার মন ভাল করার একটা অষুধই আছে। এই অষুধ ব্যবহার করুন। খুব বেশি লজ্জা লাগলে দরজা ভিজিয়ে দিন।

তিথি দরজা ভিজিয়ে দিল।

মারুফ হাসি মুখে বলল, শোন তিথি তোমার এই **act of kindness** এর কারণে তোমার হলুদ কোটের কাজটা করে দেব। মন্ত্রীকে বলব তার কথা।

তিথি কোমল গলায় বলল, থ্যাংক য়্যু।

শায়লার বুকে ধ্বক করে একটা ধাক্কা লাগল।

কি সুন্দর লাগছে তিথিকে। তাঁর মেয়েটা এত সুন্দর? আশ্চর্য এত সুন্দর তাঁর এই মেয়ে? এতদিন কেন তা চোখে পড়ল না।

তিথি পা তুলে মাথা নিচু করে খাটে বসে আছে। আজ তার গায়ে হলুদ তাকে সাজানো হয়েছে ফুলের মালায়। তাকে দেখে মনে হচ্ছে বিছানায় একটা লালপদ্ম ফুটে আছে। শায়লার চোখে পানি এসে গেল। ঘর ভর্তি মানুষ। তিনি তাঁদের অগ্রাহ্য করেই শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। তিথি চোখ তুলে তাকাল। শায়লা বললেন, তোমরা সবাই এই ঘর থেকে যাওতো। সবাই যাও। আমি আমার মেয়ের সঙ্গে একটু কথা বলব।

সবাই চলে গেল। শায়লা বললেন, মা তুই খানিকক্ষণ আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতো।

তিথি বলল, কেন মা?

'এখনো তুই পুরোপুরি আমার। বিয়ে হয়ে গেলেতো এই কথাটা বলতে পারব না। আয় মা শুয়ে থাক।'

শায়লা বসলেন। তিথি তাঁর কোলে মাথা রেখে কোমর জড়িয়ে শুয়ে রইল। শায়লার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি তিথির গালে পড়ছে। তিথি বলল, মা তুমি কি জান এই পৃথিবীতে আমি তোমার চেয়েও যাকে ভালবাসি সে কে?

'জানি। তোর বাবা।'

'হ্যাঁ। তুমি আমার এই বাবাটাকে কেন কষ্ট দাও? তাঁরচে ভালমানুষ কি তুমি এখন পর্যন্ত আর কাউকে দেখেছ? সত্যি করে বল।'

'না।'

'তাহলে কেন এমন কষ্ট দাও। তুমি আজ আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করবে বাবাকে কষ্ট দেবে না। আমিতো থাকব না, বাবাকে দেখার কেউ থাকবে না। এই জন্যেই তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে বলছি।'

'আচ্ছা যা প্রতিজ্ঞা করলাম। মাঝে মাঝে এমন বিরক্ত করে যে অসহ্য লাগে।'

'যত অসহ্যই লাগুক আর তুমি বাবাকে কষ্ট দেবে না।'

'আচ্ছা যা দেব না।'

'কিছুক্ষণ আগে শুনলাম নুরুজ্জামান সাহেবকে তুমি কঠিন গলায় বকাবকি করছ। কেন মা?'

'আরে ওকে বলেছি আজ বাড়িতে লোকজন আসবে । ভাল একটা কাপড় পরতে। সে একটা হলুদ কোট গায়ে দিয়ে ঘুরছে। গলায় মাফলার।'

'বেচারার কোটটা খুব পছন্দ। মা তুমি উনাকে একটা ভাল কোট কিনে দাও।'

'তোকে বলতে হবে না। আগেই ঠিক করে রেখেছি। রেডিমেড স্যুট পাওয়া যায় ঐ একটা কিনে দেব।'

'উনাকে তোমার খুব পছন্দ হয়েছে তাই না মা?'

'পছন্দ হবে না কেন? ভাল ছেলে ঘোর প্যাঁচ নাই।'

'উনাকে কেন পছন্দ হয়েছে সেই রহস্য কিন্তু আমি জানি মা।'

'কি রহস্য?'

'উনি তোমাকে মা ডাকেন এই জন্যেই তাঁকে তোমার এত পছন্দ।'

'মা ডাকলেই পছন্দ করতে হবে না-কি? মাতো কতজনই আমাকে ডাকে। দুনিয়ার যত ফকির সবই আমাকে মা ডাকে। ওদের আমি পছন্দ করি?'

'তাহলে কেন পছন্দ কর উনি বোকা বলে? পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ বুদ্ধিমানদের দু'চোখে দেখতে পারে না। বোকাদের তারা পছন্দ করে।'

'উদ্ভট উদ্ভট কথা বলিসনা তো মা। ও বোকা এটা তোকে কে বলল?'

'বোকা তো বলতে হয় না। কপালে লেখাও থাকে না। বোঝা যায়। তিনি আমার বিয়ের কার্ড শিক্ষামন্ত্রীকে দিয়ে এসেছেন। বিয়েতে দাওয়াত করে এসেছেন। একজন বোকা লোক ছাড়া এই কাজ কে করবে? আবার ইরা মীরাকে এসে বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী নাকি বিয়েতে আসবেন। তাঁকে কথা দিয়েছেন। হি হি হি।'

তিথি হাসছে। শায়লাও হাসছেন। তিথি হাসি থামিয়ে বলল, মা তুমি নুরুজ্জামান সাহেবকে পাঠাওতো আমি জিজ্ঞেস করি মন্ত্রী সাহেব উনাকে কি বললেন।

'থাক বেচারাকে লজ্জা দিতে হবে না।'

লজ্জা দেব না মা। এম্নি কথা বলব। উনাকে আমার নিরিবিলিতে কয়েকটা কথা বলা দরকার। পাঠাও একটু। আর শোন মা — আমি একটু চা খাব।

তিথি আসলে এক ধরনের অপরাধ বোধে ভুগছে। ঢাকা থেকে সিলেট যাবার সময় মানুষটাকে এক অর্থে অপমানই করা হয়েছে।

মারুফ যখন ট্রেনের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিল তখন সে কি রকম অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। অবাক এবং বিস্ময়। না না বিস্ময় না সে তাকিয়েছিল ব্যথিত চোখে। এই ব্যথা দূর করে দেয়া দরকার।

নুরুজ্জামান লজ্জিত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল।

তিথি বলল বসুন নুরুজ্জামান সাহেব। চেয়ারটায় বসুন। কেমন আছেন?

'ভাল।'

'মন্ত্রীর কাছে না-কি গিয়েছিলেন?'

'জ্বি। উনার পিএ প্রথমবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। পরের বার আর কিছু লাগে নাই।'

'কাজ হয়েছে আপনার?'

'জ্বি। স্কুল স্যংশনের অর্ডার হয়েছে।'

'বলেন কি?'

'মানুষদের মধ্যে যেমন ভাল মন্দ আছে। মন্ত্রীদের মধ্যেও তেমন ভাল মন্দ আছে। উনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন তার তুলনা নেই।'

'শুনে ভাল লাগল। আমরাতো সারাক্ষণ মানুষ সম্পর্কে মন্দ কথাই শুনি।'

নুরুজ্জামান ইতস্ততঃ করে বলল, আমি উনাকে মারুফ সাহেবের স্কলারশীপের ব্যাপারটাও বললাম।

তিথি বিস্মিত হয়ে বলল, আপনাকে কে বলতে বলল?

'না কেউ বলেনি। আপনি মা'কে বলছিলেন — নো অবজেকশান দিচ্ছে না। শুনে মনটা খারাপ হয়েছে। তারপর ভাবলাম সুযোগ যখন পাওয়া গেছে তখন বলে ফেলি।'

'উনি কি বললেন সব ঠিক করে দেবেন?'

'উনি সঙ্গে সঙ্গে কাগজ পত্র আনালেন।'

'তারপর?'

'উনি বললেন ফ্রান্সের স্কলারশীপের কোন কাগজপত্রতো ফাইলে নেই। উনার ধারণা কোথাও কোন ভুল হয়েছে। উনি বললেন আমি যেন ঠিক ঠাক ইনফরমেশন জোগার করে তাকে দেই কিংবা মারুফ সাহেবকে তাঁর কাছে নিয়ে যাই। আমি মারুফ সাহেবের কাছে গেলাম। উনি আবার সব শুনে আমার উপর খুব রাগ করলেন।'

'রাগ করে কি বলল?'

নুরুজ্জামান চুপ করে রইল। মারুফ রাগ করে যে সব কুৎসিত কথা বলেছে তা তার বলতে ইচ্ছা করছে না। তিথি বলল, আপনি ওর কথায় রাগ করবেন না। ওর স্বভাবই এমন। ও কারোর কাছ থেকে সাহায্য নিতে চায় না।

'আমি রাগ করিনি। উনার যাবার ব্যাপারে যেন কোন সমস্যা না হয় এই জন্যেই আমি . . .।'

'ওর কোন সমস্যা হবে না। আর সমস্যা হলে ও নিজেই তা মেটাবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আপনি যে কাজে এসেছেন সেটা যে ভালমত হয়েছে তাতেই আমি খুশি। কি নাম যেন আপনার স্কুলের?'

'বেগম রোকেয়া গার্লস হাই স্কুল।'

'স্কুল তৈরি হোক। চালু হোক। তারপর একদিন আপনার স্কুল দেখে আসব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

মীরা ঘরে ঢুকল চা নিয়ে। চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, বড় মামা এসেছেন। আপা তোমাকে ডাকছেন। মা'র ঘরে বসে আছেন।

তিথির বড় মামার মুখ অন্ধকার। তিথি অবাক হয়ে দেখল শুধু যে মামার মুখ অন্ধকার তাই না। বাবা মা দু'জনের মুখই অন্ধকার। মা'র শরীর কাঁপছে। বাবা বসে আছেন মাথা নীচু করে।

তিথি বলল, কি হয়েছে মামা?

'বোস এখানে। দরজাটা ভিজিয়ে দিয়ে এসে বোস।'

তিথিকে দরজা বন্ধ করতে হল না। শায়লা নিজেই উঠে দরজার হুড়কা লাগিয়ে দিলেন। সাইদুর রহমান সাহেব মুখের পাইপ টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, কি বলছি মন দিয়ে শোন। তোর বাবা আমাকে তোর পাসপোর্ট দিয়ে বলেছিল তুই যেন মারুফ ছেলেটার সঙ্গে এক সঙ্গে বাইরে যেতে পারিস সেই ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে। আমি খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি মারুফ ছেলেটার বাইরে যাবার কোন ব্যাপার নেই। এটা তোকে সে মিথ্যা বলেছে।

তিথি তাকিয়ে রইল। সে কিছুই বলল না।

সাইদুর রহমান সাহেব বললেন, সঙ্গত কারণেই আমি খুব চিন্তিত বোধ করলাম। আমরা জানি তোর বাবা-মা কোন খোঁজ খবর করবে না। ওরা ঝগড়া ছাড়া অন্য কিছু পারে না। খোঁজ নিয়ে আরো কিছু জিনিস জানলাম।

তিথি কঠিণ গলায় বলল, কি জানলে?

'তোর বাবা বলছিল ছেলের বাবা কলেজে অঙ্কের প্রফেসর ছিল। আমি যা জেনেছি তা হল ঐ লোকের নেত্রকোনা শহরে একটা দরজির দোকান আছে। সে দরজি।'

তিথির মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। জাফর সাহেব মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যথিত গলায় বললেন, ছেলের বাবা কি করেন সেটা কোন ব্যাপার না।

সাইদুর রহমান সাহেব বললেন, তোমার কাছে হয়ত কোন ব্যাপার না। আমার কাছে ব্যাপার। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হবার আগেই বিয়ে বন্ধ হওয়া দরকার —

আমার যা বলার বললাম। বাকি তোমাদের বিবেচনা। আমি তিথিকেই জিজ্ঞেস করছি। তিথি তুই কি চাস? বিয়ে হবে?

তিথি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, না।

'গুড গার্ল। কিছু কিছু সময় আসে যখন মানুষকে শক্ত হতে হয়।'

জাফর সাহেব বললেন, শোনা কথার উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত না। তিথি তুই মারুফের সঙ্গে কথা বল। চল আমি তোকে নিয়ে যাই।

তিথি বলল, না।

'হুট করে বিয়ে ঠিক করা যেমন কাজের কথা না, বিয়ে ভাঙাও তেমন কাজের কথা না।'

তিথি কঠিন গলায় বলল, বাবা, আমি মন ঠিক করে ফেলেছি।

'মন ঠিক করেছিস ভাল কথা। এক্ষুণি ঠিক করতে হবে তা তো না। সময় নে – – ঠাণ্ডা মাথায় ভাব্। ওর সঙ্গে কথা বল . . .'

সাইদুর রহমান সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, জাফর, তুমি অকারণে ঝামেলা করছ কেন? দেখছ না মেয়েটা মনস্থির করে ফেলেছে? সব কিছুর মূলে আছ তুমি। বাবা হিসেবে তোমার কি দায়িত্ব ছিল না খোঁজ–খবর করার? একজন এসে বলল, আমি শাহজাদা, ওম্নি তুমি তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেললে? একবার ভাবলেও না সে সত্যি শাহজাদা না ভয়ংকর কোন হারামজাদা?

তিথি উঠে চলে গেল। বড় মামার কুৎসিত ধরনের কথা তার ভাল লাগছে না।

প্রথমে সে গেল নিজের কামরায়। ইরা–মীরা ঘরের খাটে বসে ছিল। আপাকে ঢুকতে দেখে দু'জন এক সঙ্গে বের হয়ে গেল। তারাও মনে হয় পুরো ঘটনাটা জানে।

তিথির কেমন যেন অস্থির লাগছে। কিছুক্ষণ কাঁদতে পারলে ভাল হত। কান্না আসছে না। কেমন যেন ঘুম–ঘুম পাচ্ছে। প্রচণ্ড দুঃখের সময় মানুষের কি ঘুম পায়? এই পরিচিত শহর ছেড়ে দূরে কোথাও চলে গেলে কেমন হয়? অনেক দূরে — যেখানে কেউ তাকে চিনবে না। কেউ এসে বলবে না — তিথি, তোমার না বিয়ে হওয়ার কথা ছিল?

বাবার জন্যে তিথির খুব খারাপ লাগছে। কি রকম অদ্ভুত চোখে তিনি সবার দিকে তাকাচ্ছিলেন। তাঁর চোখ ভর্তি বিস্ময়। ঘটনাটার পর মা একবারও তার দিকে তাকাননি। সব সময় চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে রেখেছেন। তিথি লক্ষ্য করছে, মা মাঝে মাঝে শাড়ির আঁচলে চোখ চেপে ধরছেন। মা খুব শক্ত মহিলা। মা'কে তিথি খুব কম কাঁদতে দেখেছে। এই প্রথম খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে মা'কে সে দু'বার কাঁদতে দেখল। দু'বারই সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে।

'আপা!'

তিথি দেখল ইরা ঘরে এসে ঢুকেছে। সেও তার দিকে তাকাচ্ছে না। মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে।

'কিছু বলবি?'

'তোমার একটা টেলিফোন এসেছে আপা। তুমি কি ধরবে?'

'না।'

ইরা প্রায় ফিসফিস করে বলল, মা টেলিফোন ধরতে বলছে। তিথি বলল, কার টেলিফোন, মারুফের?

'হুঁ। মা তোমাকে কথা বলতে বলল।'

'মা বললে তো হবে না। আমার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আর শোন্ — তুই এমন মেঝের দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছিস কেন? আমি কি এমন কুৎসিত প্রাণি যে আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলা যাবে না।

'সরি আপা।'

ইরা চলে যাচ্ছিল, তিথি বলল, দাঁড়া আমি টেলিফোন ধরব।

তিথি টেলিফোন ধরতেই ওপাশ থেকে মারুফের খুশি-খুশি গলা শোনা গেল।

'হ্যালো, তিথি ভাল আছ?'

'আছি।'

'গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে ভাল নেই। রাতে ভাল ঘুম হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার হয়নি। বলতে গেলে আমি স্লীপলেস নাইট কাটিয়েছি। ও আচ্ছা, পরে বলতে ভুলে যাব — আমি তোমার ঐ লোক — নুরুজ্জামান — তার জন্যে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি কিছুদিনের মধ্যে বাইরে যাবেন, ওখান থেকে ফিরবেন মাসখানিক পর। তখন দেখা করতে বলেছেন। আমি ঠিক করেছি তখন নুরুজ্জামানকে সঙ্গে করে নিয়ে ওর কাজ করিয়ে দেব।'

তিথি বলল, সাত দিনের মধ্যে তোমার তো বাইরে যাবার কথা — এক মাস পর তুমি নুরুজ্জামান সাহেবের কাজ কিভাবে করিয়ে দেবে?

'ও মাই গড! বিয়ের টেনশানে সব এলোমেলো হয়ে গেছে। আমি নিজেই যে থাকব না সেটাই ভুলে গেছি। হা হা হা। যাই হোক, আমি ব্যবস্থা করে যাব। আমি না থাকলেও কাজ আটকাবে না।'

'তোমার বাবা কি ঢাকায় আছেন?'

'এখন নেই, কাল আসবেন।'

'উনি তো তোমাদের ওখানকার কলেজের অংকের প্রফেসর। তাই না?'

'আমাদের এখানের না। বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অংকের প্রফেসর ছিলেন। সেই আমলে অংকে অনার্স নিয়ে এম. এ. পাশ করেছিলেন। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। এম. এ.-তে তিনি এবং নরেশ গুহ দু'জন এক সঙ্গে প্রথম হন। বাবা মুসলমান বলে কোন চাকরি পাচ্ছিলেন না। সেই নরেশ গুহ কিছুদিন আগে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির অংকের হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট হিসেবে রিটায়ার করেছেন। এর নাম ভাগ্য।'

তিথি সহজ গলায় বলল, তোমাদের কি নেত্রকোনায় কোন দরজির দোকান আছে?

মারুফ হাসতে হাসতে বলল, আছে। এটা বাবার আরেক পাগলামি। আমাদের নবিজীর চার খলিফাদের একজন না-কি দরজির কাজ করতেন। তাই বাবাও ঠিক করলেন শেষ বয়সে ঐ লাইনে যাবেন। হা হা হা।

'শোন মারুফ, তোমার বাবা অংকের প্রফেসর না দরজি, তাতে কিছু যায় আসে না। আমি তোমার বাবাকে দেখে তোমাকে পছন্দ করিনি। তোমাকে দেখেই করেছি। তুমি যে ক্রমাগত মিথ্যা বলছ এতে ভয়ংকর কষ্ট পেয়েছি।'

'শোন তিথি। মিথ্যা যে আমি বলি না, তা না। মিথ্যা বলি। তবে কখনো তোমার সঙ্গে বলি না।'

'এখনো বলছ না?'

'না।'

তিথি নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত স্বরে বলল, আগামীকাল আমাদের বিয়ে, কিন্তু আমি মনের দিক থেকে কোন সায় পাচ্ছি না। আমি বাবাকে বলে দিয়েছি, এই মুহূর্তে বিয়ের আমার কোন ইচ্ছা নেই। তোমার কাছেও খবর পাঠাতাম — ভাগ্য ভাল, তুমি টেলিফোন করলে। তোমাকেও জানিয়ে দিলাম।

'তিথি শোন।'

'আমি এখন কিছু শুনতে চাচ্ছি না। আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। রাখি কেমন?'

'বিয়ে তাহলে সত্যি সত্যি বাতিল?'

'হ্যাঁ।'

'আমার বাবা একজন দরজি — এই কারণে?'

'না এটা কোন কারণ না। আমার দাদাজান চাষাবাদ করেন, তার জন্যে তিনি মানুষ হিসেবে ছোট হয়ে যান নি।'

'আমাকে বিয়ে করা ছাড়া তোমার গতি নেই তিথি। তুমি অন্য কোথাও বিয়ে করতে পারবে না। আমি চিঠি লিখে সব জানিয়ে দেব।'

'কি জানাবে?'

'জানাব যে, তুমি আমার সঙ্গে রাত্রি যাপন করেছ। ওরা যাতে বিশ্বাস করে তার জন্যে তোমার ডান বুকে লাল তিলটির কথাও বলব।'

'আমার বুকে কোন লাল তিল নেই। আর থাকলেও তুমি দেখনি। সে সুযোগ আমি তোমাকে দেই নি।'

মারুফ বলল, মিথ্যা যখন একবার বলা ধরেছি ভালভাবেই বলব। সবাই মিথ্যাটাই বিশ্বাস করবে। তুমি তো আর কাপড় খুলে সত্যি প্রমাণ করতে পারবে না। পৃথিবীর সবাইকে আমি বলব। তোমার বাবাকে বলব। মা'কে বলব।

তিথি টেলিফোন হাতে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সে এসব কি শুনছে!

'হ্যালো তিথি হ্যালো।'

'শুনছি।'

'তোমার মা'কে টেলিফোন দাও। তাঁর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'মা'কে সব বলবে?'

'অবশ্যই বলব। কিছুই বাদ দেব না। ইনক্লুডিং দ্যা রেড বিউটি স্পট।'

'তোমার বলতে লজ্জা করবে না?'

'না। তুমি পাশে থাক। দেখ কি সুন্দর করে বলি। যদি সাহস থাকে তাহলে ডেকে দাও তোমার মা'কে।'

'ধরে থাক, আমি ডেকে দিচ্ছি।'

'গুড। ভেরী গুড। একসেলেন্ট। আছে তোমার সাহস আছে।'

তিথি তার মা'কে ডেকে নিয়ে এল। নিজেও দাঁড়িয়ে রইল মা'র পাশে। শায়লা রিসিভার কানে নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। এক সময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

তিথি বলল, কি বলল মা?

শায়লা বললেন, কিছুই তো বলেনি, শুধু কাঁদছিল। এতক্ষণ শুধু কান্নার শব্দ শুনলাম।

'কাঁদছিল?'

'হ্যাঁ। বেচারার কান্না শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেছে। তিথি, তুই কি আরেকবার ভেবে দেখবি?'

তিথি বলল, না। ওর অনেক কৌশল আছে। কান্নাটাও এক ধরনের কৌশল। তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় কাঁদবে। বাবার সঙ্গে কথা বলার সময় অন্য কিছু বলবে। আমি একজন সাধারণ মানুষকে বিয়ে করতে চাই মা, যে কোন রকম কৌশল জানে না।

রাত এগারোটার মত বাজে।

তিথিদের বাসা শান্ত হয়ে আছে। ইরা-মীরা তাদের ঘরে, দরজা বন্ধ। আলো নেভানো। হয়ত শুয়ে পড়েছে। কিংবা হয়ত ঘর অন্ধকার করে চুপচাপ দু'বোন বসে আছে।

জাফর সাহেব বসে আছেন বারান্দায়। বারান্দার বাতিও নেভানো। এই বাড়ি আজ এক অভিশপ্ত বাড়ি। আজ রাতে এই বাড়ির একটি মেয়ের বিয়ে হবার কথা ছিল। এই বাড়িতেই বাসর হবার কথা ছিল।

তিথি খুব কাঁদছে। তার হাতে তার নীল তোয়ালে। তিথির সমস্ত দুঃখ ধারণ করার ক্ষমতা কি এই সামান্য নীল তোয়ালের আছে?

শায়লা মেয়ের পিঠে হাত রেখে মূর্তির মত বসে আছেন। এই ঘরের বাতিও নেভানো। অন্ধকারই ভালো। দুঃখের রাত তো অন্ধকারই হবে।

ভেজানো দরজায় টুক টুক করে শব্দ হল। নুরুজ্জামান ভীত গলায় বলল, মা, একটু শুনবেন?

শায়লা বের হয়ে এলেন। নুরুজ্জামান বলল, রাত দেড়টার সময় একটা ট্রেন আছে। আমি চলে যাব। যাবার আগে আপনার পা ছুঁয়ে একটু সালাম করতে চাচ্ছিলাম।

নুরুজ্জামান নিচু হয়ে সালাম করল। শায়লা বললেন, দুঃখের দিনে চলে যাচ্ছ। আচ্ছা যাও। থেকেই বা কি করবে! আবার কোন দিন যদি মেয়ের বিয়ে ঠিক হয় তোমাকে খবর দেব, তুমি এসো।

'জ্বি আচ্ছা। আমি কি তিথির সঙ্গে একটু কথা বলব মা? যদি অনুমতি দেন।'

'অনুমতির কি আছে? তিথি কথা বলবে কি-না সেটাই হল কথা। এসো, ভেতরে এসো।'

নুরুজ্জামান ঘরে ঢুকলো।

শায়লা বললেন, তিথি, নুরু চলে যাচ্ছে। তোর কাছে বিদায় নিতে এসেছে — বলে তিথির ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। মনে হচ্ছে নুরুজ্জামান একা কিছু কথা বলতে চায়। বলুক।

তিথি ধরা গলায় বলল, আপনি আবার আসবেন। সিলেটে যাবার সময় আপনাকে অপমান করেছি। কিছু মনে রাখবেন না। সে রাতে আপনি যেমন কষ্ট পেয়েছিলেন। আমিও কষ্ট পেয়েছিলাম।

নুরুজ্জামান বলল, আমি কিছু মনে করি নি। আমি অতি সামান্য মানুষ। এই সামান্য মানুষকে আপনারা যে ভালবাসা দেখিয়েছেন তা আমি সারাজীবন মনে রাখব। আমি আপনাকে ছোট্ট একটা কথা বলতে চাই। বলব?

'বলুন।'

'মারুফ সাহেব যে কাজগুলি করেছেন, আপনাকে ভালবাসেন বলেই করেছেন। আজ যদি তাঁকে আপনি দূরে সরিয়ে দেন তাহলে সবচে বড় কষ্টটা হবে আপনার আপনি কোনদিনই মানুষটাকে ভুলতে পারবেন না। বনের পাখি উড়ে যায় কিন্তু মায়া পড়ে থাকে। মায়ার কষ্ট ভয়ংকর কষ্ট।'

'কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আমার আছে নুরুজ্জামান সাহেব।'

'কষ্ট সহ্য করার দরকার কি? মারুফ সাহেবের চরিত্রে অনেক ভুল-ত্রুটি আছে। সেই সব ভুল-ত্রুটি আপনি যদি ভালবাসা দিয়ে ঠিক না করতে পারেন তাহলে কিসের আপনার ভালবাসা?'

তিথি বিস্মিত গলায় বলল, আপনি এত সুন্দর করে কথা বলা কোথায় শিখলেন?

নুরুজ্জামান বলল, আমি আপনাদের কাউকে না জানিয়ে একটা কাজ করেছি। হয়ত অন্যায় করেছি, তবু করলাম।

তিথি বিস্মিত হয়ে বলল, কি করেছেন?

'আমি মারুফ সাহেবকে তাঁর বাসা থেকে নিয়ে এসেছি। উনি নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি। আপনি যেমন কাঁদছেন, উনিও কাঁদছেন। বিশ্বাস না হলে নিচে এসে দেখুন। আসবেন?'

অনেকক্ষণ তিথি চুপ করে রইল। একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, যান তাঁকে ডেকে নিয়ে আসুন।

নুরুজ্জামানের ট্রেন রাত দু'টায়। এখনো কিছু সময় আছে। সে যাবার আগে ইরা-মীরাকে পাতার বাঁশি শুনাচ্ছে। শুধু ইরা-মীরা না, জাফর সাহেব এবং শায়লাও খুব আগ্রহ নিয়ে বাঁশি শুনতে এসেছেন।

তিথি কথা বলছে মারুফের সঙ্গে। থাকুক, তারা কিছুক্ষণ একা থাকুক।

তিথিদের ঘরের বাতি জ্বলছে। মারুফ কোনই কথা বলছে না। সে বসে আছে মাথা নিচু করে।

এক সময় মারুফ বলল, বিশ্রী শব্দ কোত্থেকে আসছে?

তিথি বলল, বাঁশির শব্দ। মনে হয় নুরুজ্জামান সাহেব পাতার বাঁশি বাজাচ্ছেন।

'এ তো ভয়াবহ জিনিস!'

তিথি হেসে ফেললো। তার হাসি আর থামছে না। মারুফও খুব হাসছে।'

নুরুজ্জামান রবীন্দ্র সংগীতের সুর তোলার চেষ্টা করছে। পাতাগুলি ভাল না, সুর আসছে না — নুরুজ্জামান বাজাতে চেষ্টা করছে —

ভালবেসে যদি সুখ নাহি
তবে কেন মিছে এ ভালবাসা।

পাতার বাঁশিতে সুর না ধরলেও যাদের জন্যে এই বাণী তারা হয়ত ঠিকই বুঝেছে কারণ এক সময় তিথি কোমল গলায় বলল, তুমি কাছে আস তো, তোমার মাথার চুল আঁচড়ে দেই।